কালিদাস ব্যাখ্যা

(প্রথম খণ্ড)

মেঘদূত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মেঘদূত ব্যাখ্যা।

——:o:——

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্. এ.

প্রণীত।

কলিকাতা।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

১৩০৯।

মূল্য দশ আনা মাত্র।

Calcutta:
PRINTED BY R. DUTT,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
1902.

বিজ্ঞাপন।

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত সাহিত্যে অমর কবি। কল্পনার মহিমায় বল, ভাষার ছটায় বল, শিল্পের নৈপুণ্যে বল, বাঁধুনির কারিগরীতে বল ইঁহাদের তুলনা হয় না। ইঁহাদের রচনার মধ্যেও আবার পাঁচখানি বই সকলের চেয়ে ভাল, সকলের চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে মহিমাময়। হিমালয়ের যেমন পাঁচটী চূড়া, গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলাগিরি, মুক্তিনাথ ও গোসাই থান, সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমনি রঘুবংশ, উত্তরচরিত, শকুন্তলা. মেঘদূত ও কুমার সম্ভব অতি উচ্চ, অতি গম্ভীর, অতি শোভাময়, অতি পরিষ্কার ও অতি রমণীয়।

পাঁচখানি কাব্যেরই অনেক ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা কিন্তু অধিকাংশই সংস্কৃত বুঝাইবার জন্য। ভাব বুঝান কোন কোন ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হইলেও সৌন্দর্য্য বুঝান কোন ব্যাখ্যারই উদ্দেশ্য নহে; অথচ কাব্যগুলি সৌন্দর্য্যের খনি, ছোট খাট খনি নয়, একেবারে জোহানেসবর্গ। এই সৌন্দর্য্যের কিছু কিছু বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করি অনেক দিন ধরিয়া ইচ্ছা ছিল। এজন্য ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; ক্রমেই ইহাদের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্য্যের চমৎকারিতাও ততই

পাড়িয়া যাইতেছে। তাই মনে করিয়াছিলাম সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা কিছু লিখিয়া রাখা আবশ্যক, সেই জন্যই সকলের ছোট যে মেঘদূত তাহারই ব্যাখ্যায় প্রথম প্রবৃত্ত হই। প্রবৃত্ত হইয়াই দেখি, মেঘদূত সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাব্য, উহাতে প্রাচীন ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক জটিল কথা আছে। সেগুলি একরূপ মীমাংসা করিয়া লইলাম। লেখা শেষ হইল। ছাপানর ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং ইচ্ছামত লিখিলাম। লিখিয়া ছাত্রবর্গ ও মিত্রবর্গকে দেখাইলাম। তাঁহাদের সমালোচনা শুনিলাম। বদলাইয়া শোধরাইয়া লইলাম। কিন্তু এক কথায় বড় ঠেকিয়া গেলাম। সৌন্দর্য্যের মুখে রুচির উপর বড় একটা ঝোঁক থাকে না। রুচি দেশ কাল পাত্র অনুসারে বদলায়, সৌন্দর্য্য বদলায় না। এখন যাহা কুরুচি, কালিদাসের সময়ে তাহা কুরুচি ছিল না। আমি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি, আমাকে কালিদাসের বশেই যাইতে হইল। অনেক জিনিস এখনকার রুচিসঙ্গত হইবে না বেশ বোধ হইল। কিন্তু যখন ছাপাইব না, তখন তাহার প্রতি আমার লক্ষ্য রহিল না।

যাঁহারা পড়িলেন, তাঁহারা ছাপাইতে অনুরোধ করিলেন, আমি গোলে পড়িয়া গেলাম। কোনটা এখনকার রুচিসঙ্গত, কোনটা নয়, এ কথা কে বলিয়া দিবে? শেষ দুই জন সুপণ্ডিত, সুরসিক, বিচক্ষণ লোকের হাতে রুচিপরীক্ষার ভার দিলাম। এক জন চব্বিশ পরগণার জজ শ্রীযুক্ত এফ. ই. পার্জ্জিটর সাহেব আর একজন শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—দুজনেই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মূলের সহিত ব্যাখ্যা মিলাইয়া আমায় সদুপদেশ দিয়া চিরবাধিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পার্জ্জিটার সাহেব বিলাত যাইতে-

লেন। তিনি আমার প্রুফ লইয়াই জাহাজে আরোহণ করেন ং জাহাজ হইতে আদ্যোপান্ত পড়িয়া উপদেশ প্রদান করেন। দের উপদেশমত অনেক স্থান উঠাইয়া দিয়াছি ও অনেক ন বদলাইয়াছি। সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু সুরু- অনুরোধে তাহা স্বীকার করিয়াছি। সংস্কৃতকালেজের যোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রথম তেই আমায় উৎসাহ দিয়াছেন এবং অনেকবার এ ব্যাখ্যা ড়িয়াছেন। কিন্তু যাঁহার উৎসাহে আমার এ ব্যাখ্যালেখায় বৃত্তি, যিনি নিরন্তর অকাতরে আমায় সাহায্য করিয়াছেন ও রিতেছেন, যাঁহার নামে এই ব্যাখ্যা উৎসর্গ করিলেও আমার প্ত হইত না, এবং যাঁহার ঋণ আমি কখনই শোধ করিতে পারিব ।, তিনি উৎসর্গ গ্রহণ করা দূরে থাকুক্, আপনার নাম প্রকাশ রিতেও দিলেন না; তাঁহাকে নির্ব্বাক্ ধন্যবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হলাম।

ংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গালার ব্যাখ্যা নূতন। ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাক- ছাড়িয়া, অলঙ্কার ছাড়িয়া, শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা নূতন। ান্দর্য্য বুঝাইতে গিয়া ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্বভাব, নর- চরিত প্রভৃতির কথা তোলা নূতন। এত নূতন করিতে গিয়া যদি ভুল ভ্রান্তি হইয়া থাকে, পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন। প্রথম থকের ভুল ভ্রান্তি অনিবার্য্য। এ পথে আর যদি কেহ অগ্রসর ন এবং মনের মতন ব্যাখ্যা করিতে পারেন, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

মেঘদূত।

—:o:—

পূর্ব্বমেঘ।

অদ্য মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্ব্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। পড়িয়া দেখিলাম, মনোমত হইল না—ফিকে লাগিল। তখন পূর্ব্বমেঘ কালিদাসের ভৌগোলিকবিবরণলেখকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন সেরূপ করিতে ভরসা হয় না। করিলে মনে হয়, কালিদাসের আদর করিতে শিখি নাই। পূর্ব্বমেঘ মেঘদূতের অর্দ্ধেক, তাই যদি ছাড়িয়াছিলাম, তবে ব্যাখ্যা করিয়াছি কি ছাই? উত্তরমেঘেও অনেকস্থান ভাসা ভাসা ছিল, অনেকস্থানের সৌন্দর্য্য-বোধই হয় নাই। তাই আবার একবার নূতন করিয়া ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।

ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েকটী কথার মীমাংসা চাই। তাহার মধ্যে মেঘদূতের যে প্রচলিত সমালোচনা আছে, যে কালিদাস গ্রন্থ লিখিয়া একজন মালিনী, কি কুমারণীকে শুনাইতেন, তাহার সম্মতি পাইলে প্রচার করিতেন। সে পূর্ব্ব-মেঘ শুনিয়া বলিয়াছিল উহা স্বর্গের সিঁড়ি অর্থাৎ উত্তর-মেঘই সারবস্তু, পূর্ব্ব-মেঘ কিছু নয় এ কথাটা সত্য কি না? একেবারে কিছু নয় অর্থাৎ কেবল সিঁড়ির কাজ করে, এটা বড় অশ্রদ্ধেয় কথা। কিন্তু এই অশ্রদ্ধেয় কথায় শ্রদ্ধাবান হইয়া আবহমান কাল লোকে পূর্ব্বমেঘের প্রতি অনাদর করিয়া আসিতেছে। মনে করে ওটা একটা, ভূগোলের ইণ্ডেক্স্, পড়িলে উত্তর-মেঘ বোঝার একটু সুবিধা হয়, তাহাই পড়িতে হয়। বাস্তবিকও লোকের অপরাধ নাই, দেশগুলা কোথায়,—জানা ছিল না। একটার পর আর একটা ঠিক কি না, জানা ছিল না। লোকে এক রকম ভাসা ভাসা পড়িত, বড় বিরক্ত লাগিত। মল্লিনাথের টীকাও এই রকম ভাসা ভাসা; আমিও বিশ বছর পূর্ব্বে এইরূপ ভাসা ভাসা ভাবেই উহা রজনীবাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্ব-মেঘ কালিদাসের কবিত্বের একটী ভাবময় লহর। উহাতে জড়-প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করিয়া তুলিয়াছে। মেঘ নিজে জড় হইয়াও চৈতন্যময়; মেঘ উপর হইতে যখন জড়প্রকৃতির যতদূর দেখিতেছে, তখন ততদূরই চৈতন্যময় হইয়া যাইতেছে। জড়কে এত-সুন্দরভাবে চৈতন্যময় করিতে

আর কোথাও দেখা যায় না। কালিদাস আর কোথাও পারেন নাই। কুমারে রঘুতে বড় বড় বর্ণনায় জড়—জড়ই। কুমারের ষষ্ঠে হিমালয়কে জড় ও চৈতন্য দুইই বলা হইয়াছে, কিন্তু সে দুটী দুরূপ। পূর্ব্ব-মেঘে যে জড়, সেই চৈতন্যময়, ভাবময়, প্রেমময়।

দ্বিতীয় কথা। মেঘদূতকে অলঙ্কারশাস্ত্রে খণ্ডকাব্য বলে; ইংরেজেরা লিরিক বলেন। কোনটী সত্য? খণ্ডকাব্য,—অর্থ যতদূর বুঝা যায়,—টুকরা কাব্য বলিয়াই বোধ হয়, টুকরা কাব্য বলিয়া মেঘদূতের উল্লেখ করিলে জিনিসটার অবমান করাই হয়। মেঘদূত টুকরা নহে—পূরা, সর্ব্বাঙ্গে সুশোভিত, সম্পূর্ণ, এবং অপ্রমেয়। সুতরাং মেঘদূত টুকরা কাব্য নহে। ছোটকাব্য বলিতে চাও বল। দৈর্ঘ্যে ছোট কিন্তু ফলে ছোট নয়। কিন্তু খণ্ড বলিতে ত ছোট বুঝায় না। লিরিক বলিলে যাহা বুঝায় উত্তর-মেঘে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু তথাপি উত্তর-মেঘকে লিরিক বলা যায় না। কারণ উহা গানে লিখিত নহে। লিরিক গান না হলে হয় না, কাব্যের বাহ্য আকার লইয়াই লিরিক। তবে উৎকৃষ্ট লিরিকের যে ভাবতন্ময়তা আছে, উত্তর-মেঘে সেইরূপ ভাব তন্ময়তা আছে বলিয়া উহাকে লিরিক বলিতে ইচ্ছা কর, বলিতে পার। কিন্তু পূর্ব্ব-মেঘের অবাধ কল্পনার রমণীয় সৃষ্টিকে লিরিক বলিবে কিরূপে, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। তবে যদি কেহ বলে খণ্ড

শব্দের অর্থ খাঁড় গুড়,—তখনকার প্রধান মিষ্টসামগ্রী। আমাদের রাতাবী মনোহরা। তন্ময়কাব্য খণ্ডকাব্য। তাহা হইলে কতক রাজী আছি। সেকালে খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৈষধকার খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। ষষ্ঠে ব্রহ্মগুপ্ত জ্যোতিষে খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। আমরা এখন যেমন বলি অমিয় নিমাই-চরিত, তেমনি সেকালে খণ্ড-কাব্য অর্থে মধুময় অমৃত-ময় কাব্য। টুক্‌রা ফুকরা বলিলে জমে না।

তৃতীয়। মেঘদূত যে লিরিক নয়, উহা যে টুকরা বা ছোট কাব্য নয় এ ত ঠিক। আমি বলি, উহার মত এক খানা মহা-মহা-কাব্য আর রচনা হয় নাই। মহাকাব্যে নূতনসৃষ্টি অনেক থাকে, কিন্তু সে কি সৃষ্টি? এই পৃথিবী, এই আকাশ, এই মানুষ, এই মনুষ্যচরিত্র, এই গাছ এই পালা—এই সব —তবে সাজান গোজান নূতন করিয়া। না হয় একটা দুটা মানুষ নূতন করিয়া গড়া। কিন্তু মেঘদূতে সব নূতন সৃষ্টি, পৃথিবী, গাছ, পালা, বন, জঙ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, সমাজ, সামাজিক, সব ছাড়িয়া নূতন সৃষ্টি। মেঘদূত এক অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি, সৃষ্টি-ছাড়া বলিতে চাও বল। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি-ছাড়া বলিও। কবির সৃষ্টির কথা বলিও না। অলকা এক নূতন সৃষ্টি। এত বড় ভারতবর্ষটা ইহাতে কালিদাসের কুলাইল না। তিনি ভারতবর্ষ ছাড়া অনেক দেশ জানিতেন। পারস্য জানি-তেন, যবনদেশ জানিতেন, যে সকল দ্বীপ হইতে লবঙ্গ

পুষ্প কলিঙ্গে আনীত হইত, তাহাও জানিতেন ; এ সকল দেশে তাঁহার পছন্দ মত জায়গা পাইলেন না। তাই তিনি হিমালয়ের তুঙ্গতমশৃঙ্গে—মনুষ্যের অগম্য—কেবল তাহার কল্পনামাত্রের গম্য—স্থানে অলকানগর বসাইলেন। তাঁহার নগরে পার্থিব নগরের নিয়মাবলী খাটিবে না। তাঁহার নগর তিনি যত ইচ্ছা সুখময়, আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারিবেন। আর সেই নগরে যাহারা বাস করিবে, তাহারাও কল্পনারাজ্যের লোক, মানুষ তাহাদিগকে দেখে নাই, দেখিবেও না। তাহাদের সমাজনীতি, শাসনপ্রণালী, সব নূতন। সব কালিদাসের অবাধ কল্পনার অমৃতময় ফল। ইয়ুরোপ বহুকাল ধরিয়া সংসার কিসে সুখময় হয়, ভাবিয়াই অস্থির। প্লেটোর রিপব্লিক, মিল্টনের এরিওপ্যাগাইটিকা, সার টমাস মুরের ইউটোপিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে মানুষ কিসে সংসারটা সুখময় করিতে পারে, তাহার অনেক চেষ্টা চরিত্র আছে। কালিদাস মেঘদূতে চেষ্টা চরিত্র ছাড়াইয়া উঠিয়া সেই আনন্দময়, সুখময়, প্রেমময় সংসার সৃষ্টি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ ত নূতন সৃষ্টি—কবির সৃষ্টির এত প্রকাণ্ড খেলা—ইহাকে কি লিরিক বলিলে, না খণ্ড কাব্য বলিলে তৃপ্তি হয়। আমি একবার এডিসনের নকলে ইহাকে (merum sal)"মধুর কবল" বলিয়াছিলাম। ছি! কি ভুলই করিয়াছিলাম। মেঘদূত লইয়া যতই আন্দোলন করিতেছি, উহার অসীম সৃষ্টিনৈপুণ্য, উহার ভাবময়, চৈতন্যময়, উচ্ছ্বাস-

ময়,আবেগময় কবিত্বলহরী যতই মনোমধ্যে গ্রথিত হইতেছে, ততই উহাতে কালিদাসের অদ্ভুত কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি।

যক্ষপত্নী। মেঘদূতের প্রধান আকর্ষণমন্ত্র যক্ষপত্নী। মেয়েটী দেখিতে মন্দ নয়। তন্বী—ক্ষীণাঙ্গী—যাঁহারা দোহারা দোহারা চান, তাঁহাদের পছন্দ হইবে না। শ্যামা—কাল নয়—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা—কাঁচাসোণার মত রঙ। শিখরি-দশনা—মল্লিনাথ অর্থ করিয়াছেন কোটিযুক্তদশনা অর্থাৎ ইঁদুরদাঁতী—টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অর্থ করিতেন, দাড়িম্ববীজের ন্যায় দশনযুক্ত—যাহার দাঁতগুলি দাড়িম দানার মত। পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—পাকা তেলাকুচার মত দুটী ঠোঁট। মধ্যে ক্ষামা—কোমরটী সরু। সরু কোমর বড় সুন্দর বলিয়া আমাদের কবিদের ধারণা। তাই কেহ কেহ এত সরু করেন যে দেখাই যায় না, কখন বলেন "পরমাণু-মধ্যা," কখন বলেন "সদসৎসংশয়গোচরোদরী"। কালিদাস এত উৎকট বর্ণনার বড় পক্ষপাতী নহেন। "চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা"—হরিণের চোখ্,মুখের তুলনায় খুব বড়,পটলচেরা, আর তার উপর ঢলঢল করিতেছে; মানুষের চোখের যে অংশ সাদা,হরিণের সে টুকু জলের মত,কেমন ঢলঢল করে, তাহার উপর যখন আবার সেই হরিণ ভয় পায়, তখন সেই ঢলঢলে চোখ আরও ঢলঢলে হয়; যক্ষপত্নীর চোখদুটী তেমনি। "নিম্ননাভি"; তাহার নাভি গভীর। "শ্রোণিভারাৎ

অলসগমনা"। উহার নিতম্ব বড় ভারি বলিয়া উহার গতি অতি মন্থর। চলিলেই বোধ হয়, হেলে দুলে, ঠমকে চমকে, পা ওঠে কি না ওঠে, এমনি ভাবে ধীরে ধীরে যাইতেছে। তাহার উপর আবার "স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্"। স্তনভারে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাই বলে কুঁজো নয়। আর তিনি বড় একটা কথা কন না—যখন কথা কন দুচারিটি। এ রমণীকে আপনারা আহামরিই বলুন; পাঁচপাঁচিই বলুন; বা চলনসই বলুন; কালিদাস ইহার এই পর্য্যন্তই বর্ণনা করিয়াছেন। কুবেরের রাজধানীতে, অত ধনের জায়গায়, এই যে নম্বর ওয়ান, তাহা বলিতে পারি না। কালি-দাসও সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যক্ষ বেচারা উহাকে রমণীসৃষ্টির আদ্য বলিয়া মনে করিত। সে মনে করিত, বিধাতা রমণীসৃষ্টির সমস্ত উপকরণ একত্র করিয়া প্রথম যে মেয়েটী গড়িয়াছিলেন সেইটাই যেন এই—আমার বৌটী। সৌন্দর্য্যের কোথাও কিছু ত্রুটী ছিল না, কোথাও বিধাতাকে হাতটান করিতে হয় নাই। বরং সব জিনিস পূরাপূরা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ষোলআনার জায়গায় আঠারআনা দেওয়া হইয়াছে। যক্ষ পত্নীকে আপনার দ্বিতীয় প্রাণ বলিয়া মনে করিত। সে ক্রমে উহাকে এতই ভালবাসিতে লাগিল যে সে আর সব কাজকর্ম্ম ভুলিয়া গেল।

যক্ষ। যক্ষ বেচারা বেশ বড় মানুষ। তাহার টাকা কত

জানেন, এক কোটী, দুকোটী নয়। কোটীর পর অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদের পর বৃন্দ, বৃন্দের পর খর্ব্ব, খর্ব্বের পর নিখর্ব্ব, নিখর্ব্বের পর শঙ্খ, শঙ্খের পর পদ্ম, তার ধন এক পদ্ম আর এক শঙ্খ ১১০০০০০০০০০০০০০। অলকায় চোর ডাকাতের ভয় নাকি একেবারেই নাই, তাই যক্ষের দ্বারে একটী পদ্ম ও একটী শঙ্খ আঁকা থাকে। তাহাতেই লোকে জানিতে পারে, ইহার কত টাকা। এখন যেমন লিমিটেড কোম্পানিরা তাহাদের মূলধন বিজ্ঞাপনে দিয়া থাকেন, সেকালেও যক্ষেরা এইরূপে তাহাদের রিজার্ভফণ্ডের বিজ্ঞাপন দিত। এদেশের মত বিজ্ঞাপনপ্রথা চলিত হয় নাই; হইলে অনেক "অনুসন্ধানের" পর তথ্য বাহির করিতে হইত। শঙ্খ ও পদ্মের পাশে বড় বড় থলে আঁকিয়া সেকালে কেমন করিয়া টাকার পরিমাণ বলিয়া দিত, নূতন যাদুঘরে কল্পবৃক্ষের চেহারা দেখিলেই লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে। যক্ষ এত ধনের মানুষ। মানুষের পক্ষে এ ধন খুব ধন, কিন্তু কুবেরের রাজধানীতে—তা মন্দ নয়—খুব যে প্রথম শ্রেণীর তা বোধ হয় না। কারণ কুবেরের সরকারে সে একটা চাকরী করিত, খুব বড় গোছের চাকরী বলিয়া বোধ হয় না; কেন না কাজে অবহেলা করে বলিয়া কুবের তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছেন। সলস্‌বরি, চেম্বারলেন, হইলে পারিতেন কি? তবে নিতান্ত ছোট চাকরীও নহে, কারণ কুবেরের দৃষ্টি তাঁহার উপর ছিল; এবং কুবের

কিছু রেগেই শাস্তি দিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয়, তিনি জুনিয়ারদের মধ্যে একজন। বেশ রাইজিং ও প্রমিসিং অফিসর ছিলেন। কিন্তু কুবের এত রাগ করেন কেন? যেহেতু সেই যক্ষটা বড় কাজে অবহেলা করিত। কেন করিত কালিদাস লেখেন নাই। কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি। পয়সা কড়ি যেমন হোক কিছু ছিল; বয়স ত যক্ষদের যৌবন ছাড়া ছিলই না। তাহার উপর এ বেচারার বয়স কম; বৌটীও সুন্দরী; বেচারা তাহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। মনে করিত বুঝি পদ্ম শঙ্খেরও উপর কোন অমূল্য নিধি পাইয়াছে। একটু আসিতে দেরী হইত; কাজে ভুল হইত; প্রথম প্রথম হয় ত কুবের টুকিয়াছিলেন; তারপর ধমকও দিয়াছিলেন; তাহার পর যখন দেখিলেন রোগ অসাধ্য, তখন তাহার প্রতীকার আবশ্যক হইল। অপরাধ ত সাব্যস্তই আছে। কি শাস্তি দেওয়া যায়? যক্ষ-পিনাল-কোর্ডে হুইপিং নাই, কারাবাস নাই, ফাইন নাই, আছে কেবল বিরহ। কুবের সেই সাজাই দিয়া দিলেন। বিরহ, এক বৎসর। উত্থান একাদশীর পরদিন যক্ষ বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে অলকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এক বৎসরের জন্য বাহির হইল। কুবের দেখিলেন, এ ছোঁড়া যে রকম পাগলা, লুকিয়ে চুরিয়ে আসিতে পারে। তাই বাহির হইবার সময় তাহার যত মহিমা ছিল, সব কাড়িয়া লইলেন। সে যে আর দেবযোনির ন্যায় অণু হইয়া, লঘু হইয়া, চারি

দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আবার তাহার স্ত্রীর কাছে আসিবে, বা তাহার সঙ্গে দেখা শুনা করিবে, কুবের সে পথ মারিয়া দিলেন। এখন সে বেচারা যায় কোথায়? ভারতবর্ষের যাবতীয় স্থান বিবেচনা করিয়া দেখা হইল। বড় লোকালয়ে পাঠাইলে যক্ষ পাছে বেণেদের সঙ্গে জুটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে। কাশী, কেদারনাথ, প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলে যক্ষ পাছে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দেয়। তাই দুষ্ট বুড়া কুবের মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসিয়া বলিয়া দিলেন যে, সে রামগিরিতে থাকিবে। শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েক বৎসর রামগিরিতে বাস করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তথায় তাঁহার একটা আশ্রমের কুটীর ভাঙ্গিলে তিনি আর এক আশ্রমে কুটীর নির্ম্মাণ করিতেন। যেখানে জল পাইতেন সেই খানেই জলক্রীড়া করিতেন; সীতা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। কুবের বলিয়া দিলেন, তুমি রামায়ণ পড়িয়াছ, তুমি রামগিরিতে থাক গিয়া। মনে মনে ভাবিলেন, যেমন দুষ্ট; সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন—খুব হয়েছে, এক বৎসরে একটু বিলক্ষণ জ্ঞানযোগ হইবে। বিরহের সময়ে রামসীতার মিলনের স্মৃতি উহার বিরহবেদনাটা খুব তীব্র করিয়া দিবে।

কাজেও তাই হইল। যক্ষ বেচারা যেখানে যায়, সেই খানেই দেখে রামসীতার আশ্রম—রামসীতার কুঞ্জ—রামসীতার লতামণ্ডপ। বড় বড় ছায়া-বৃক্ষের নিকট যায়,

তাহারা রাম সীতার বনবাসকালের বিবিধ বিশ্রম্ভের সাক্ষী। বড় বড় গাছ কত কাল বাঁচিয়া আছে ঠিক নাই; হয় ত রাম সীতা পুতিয়া ছিলেন, এখন প্রকাণ্ড মহীরুহ। জলে যায়, সেখানেও রামসীতার জলক্রীড়া মনে পড়ে। জলে যাইতে পারে না, স্থলে যাইতে পারে না, বনে যাইতে পারে না, গাছতলায় থাকিতে পারে না, এ অবস্থায় মানুষের কি দশা হয়? মানুষ পাগল হয়। যক্ষ অনেক কষ্টে আট মাস কাটাইল। তাঁহার শরীর কৃশ হইল, হাতে সোণার বালা ছিল খসিয়া পড়িল, তাহা সে টেরও পাইল না। তাহার বুদ্ধি শুদ্ধিরও বিকৃতি হইল। সে উত্তর দিক হইতে বাতাস আসিলে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিত, ভাবিত এই বাতাস যখন উত্তর দিক হইতে আসিতেছে, তখন এ নিশ্চয়ই প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। সে প্রস্তর খণ্ডে প্রিয়ার ছবি আঁকিয়া আপনাকে তাহার চরণপতিত করিত। রাত্রে গাছতলায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে প্রিয়াকে পাইয়াছে বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিত। হাত পা ঠিক আলিঙ্গনের ভাবেই থাকিত। কিন্তু প্রিয়া কোথায়? এই ভাবেই তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যাইত। দেখিত টপ্‌টপ্ করিয়া শিশির পড়িতেছে। বোধ হইত যেন বনদেবীরা তাহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। এ সকল পাগলামী ভিন্ন আর কি?

এইরূপে আট মাস কাটিয়া গেল। এতদিন ত কষ্টে

কাটিয়াছে ; আর কাটে না। তাহার উপর আবার মেঘ উঠিল। আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখা দিল। ছোট্‌ট একখানি মেঘ পর্ব্বতের নিতম্বে চড়িয়া আছে দেখা দিল। পর্ব্বত-খানিকটা সমতল হইয়া যেখানটায় নামিতে থাকে, তাহাকে সানু বলে ; উহার আর এক নাম নিতম্ব। এই পর্ব্বত-নিতম্ব ঢাকিয়া মেঘ রহিয়াছে, বাতাসে নড়িতেছে চড়িতেছে। বোধ হইতেছে যেন একটা তেল-কুচকুচে কাল হাতী পাহাড়ের গায়ে দাঁত মারিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া খেলা করিতেছে। আর পায় কে ? যক্ষ একেবারে উন্মাদ ; তখন আর চেতন অচেতন জ্ঞান রহিল না, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিল না। এই সময়ে কবি যক্ষের হইয়া একটা কথা কহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—মেঘ দেখিলে সকলেরই মন হু হু করে, যাহাদের সকল প্রিয় পদার্থ পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহাদেরই মন কেমন কেমন করে ; হৃদয় উদাস হয়, কি যেন কি নাই, কি যেন কি নাই, বলিয়া বোধ হয়। সেই প্রিয়বস্তু সব যদি আবার দূরে থাকে, তাহার আর কথা কি ? সেত উন্মাদ হইবারই কথা।

যক্ষের উন্মাদ একটু আলাদা রকমের। যক্ষ আবোল তাবোল বকে না। উহার উন্মাদে একটু শৃঙ্খলা আছে। সামাজিক বৈষয়িক সকল ব্যাপারের সামঞ্জস্য আছে। নাই কেবল একটি ; প্রিয়ার কথা উঠিলে আর ঠিক থাকে না। প্রণয়ের কথা উঠিলে ঠিক থাকে না। সমস্ত জড় পদার্থ

চৈতন্যময় হইয়া যায়। আপনিই হইয়া যায়; জড় বলিয়া জ্ঞানই থাকে না।

মেঘ দেখিয়াই মনে হইল শ্রাবণ আসিতেছে, প্রিয়া বাঁচে কি না বাঁচে। পরের দেশে পড়িয়া পরের সুখের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া যদি আমার এই দশা হইল, তবে সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই বাগান, সেই বাগিচা, সব আছে, কেবল আমি নাই; আমার গৃহিণীর অবস্থা আরও শোচনীয়। তাই ভাবিয়া যক্ষ মনে মনে সংকল্প করিল, একটা সংবাদ পাঠান যাক। মেঘ উত্তরদিকে যাইতেছে, এইই আমার সংবাদ লইয়া যাইবে। যেমন মনে এই কথা উদয় হইল, অমনি—পাগলের মন—সেই দিকেই ছুটিল। অমনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কুর্‌চি ফুল ফুটিয়াছে, বন আলো করিয়া রহিয়াছে। বর্ষার প্রধান সম্পত্তি কুর্‌চিফুল। কতকগুলা কুর্‌চি ফুল তুলিয়া মেঘকে উপহার দিল, এই লও মেঘ, আমার প্রীতি উপহার লও। দিয়াই মনে করিল আমার উপহার পাইয়া মেঘ বড় খুসী হইয়াছে। অমনি "আস্‌তে আজ্ঞা হোক" বলিয়া মেঘকে সম্বোধন করিল। ভাবিল, এই মেঘের কাছ থেকে কাজ আদায় করিতে হইবে। ইহার খোসামোদ করিতে হইবে। খোসামোদ যত রকম আছে, সকলের চেয়ে বংশের বর্ণনাই বড় খোসামোদ; আপনার টাকা আছে, কড়ি আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, যশ আছে, আপনি দাতা, ভোক্তা, বক্তা, বিবেচক ইত্যাদি কথায় যত

ফল হয়, তাহার চতুর্গুণ ফল হয়, আপনি বড়বংশে জন্মিয়াছেন, আপনার পূর্ব্বপিতামহগণ কত বড় বড় কাজ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি বলিলে। পাগল যক্ষের কিন্তু সে নাড়ীজ্ঞান টুকু টনটনে ছিল, সে মেঘকে দেখিয়াই বলিল আপনি বড় বংশে জন্মিয়াছেন, পুষ্কর আবর্ত্তক প্রভৃতি বড় বড় মেঘ আপনার পূর্ব্বপুরুষ, আপনার বংশ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এত বড় বংশ কি আর হয়। তাহার উপর আপনি ইন্দ্রের একজন বড় অফিসার। আপনি ইচ্ছা মত দেহপরিবর্ত্তন করিতে পারেন; কখন বড় কখন ছোট হইতে পারেন। ইচ্ছামত বিচিত্ররূপ ধারণ করিতে পারেন। তাই আমি বড় দুঃখী—প্রিয়া-বিরহী—আপনার শরণাগত হইলাম। বড় লোকের কাছে যাচ্ঞা ব্যর্থ হইলেও তাহাতে দুঃখ নাই। ছোট লোকের কাছে যাচ্ঞা সার্থক হইলেও মনটা ছোট হইয়া যায়।

তোমার একটা বড় গুণ আছে। তুমি তাপিতদিগের তাপ নিবারণ কর। ভূলোক ভুবর্লোক বড় গরম হইয়া উঠিলে তুমি তাহাদের ঠাণ্ডা করিয়া দাও। আমি প্রিয়ার বিরহ-অগ্নিতে পুড়িতেছি। আমার প্রিয়াও প্রিয়বিরহ অগ্নিতে পুড়িতেছেন। অতএব তুমি আমাদের ঠাণ্ডা কর। তুমি আমার সংবাদ লইয়া প্রিয়ার কাছে যাও। কুবেরের শাপে আমাদের বিরহ—মিলনের উপায় নাই। তুমি না দয়া করিলে, খবরটা লও-

য়ারও উপায়ও নাই। তাই বলি, যাও। সে তোমার তীর্থ স্থান, সেখানে বাহিরের বাগানে মহাদেব আছেন, তাঁহার কপালের চাঁদের আলোতে চূণকাম করা বাড়ী ঘর সব আরও চূণকামকরা হইয়াছে। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল,—তুমি যখন যাইতে থাকিবে, তুমি যখন আকাশে উঠিবে, তখন যাহাদের স্বামী বিদেশে, তাহাদের মনে কত আশা, কত ভরসা, কত সান্ত্বনা আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকিবে। তুমিই তাহাদের আশার মূল, ভরসার মূল ; তাই তাহারা হা করিয়া তোমায় দেখিতে থাকিবে ; পাছে ঝাপটার চুলগুলা চোখের উপর উড়িয়া পড়িয়া বিঘ্ন করে, তাই সেগুলাকে উঁচা করিয়া মাথার উপর ধরিয়া রাখিবে। আর তাদের চাঁদপানা মুখখানা পুরাপুরিই দেখা যাইবে। তাহারা ভাবিবে, আমার স্বামী এইবার বাড়ী আসিবে। আমার মত পরাধীন বৃত্তি না হইলে আর কে কি তুমি সাঁজোয়া পরিয়া উপরে উঠিলে আপনার প্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। যক্ষের যত কেন ঐশ্বর্য্য থাকুক না, যত মান, যত মহিমা, থাকুক না, পরের অধীন বলিয়া তাহার মনে বড়ই ধিক্কার হইয়াছিল। সে ভাবিল আমি যদি চাকরী না করিতাম, যদি দাসত্ব না করিতাম, আজ কি আমার এ দশা হয় ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যক্ষের উন্মাদে বেশ একটু শৃঙ্খলা আছে। তাহার এক উদাহরণ দেখুন—মেঘকে সে কৈলাস-যাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। যাত্রিক লক্ষণ গুলি

যে ভাল—তাহা একবার দেখাইয়া দিতে হইবে ; যক্ষ এখন সেই কাজেই ব্যস্ত হইল। সে দেখাইল পবন অনুকূল। আষাঢ় মাসে দক্ষিণ হইতে পবন উত্তরে যাইতেছে, সুতরাং পবন অনুকূল ; বামভাগে চাতক উড়িতেছে। এও একটা সুলক্ষণ। বলাকা মালাবদ্ধ হইয়া পথে তোমার সেবা করিবে। বকপংক্তিও সুলক্ষণ। চারিদিকে সুলক্ষণ। এমন মাহেন্দ্র যোগ আর হবে না। এইবার ওড়।

তবে একটী কথা আছে, মেঘ মনে করিতে পারে "তাকে কি দেখিতে পাব ?" যক্ষ তাই বলিতেছে, পাবে বই কি ? দেখিবে, সে কেবল দিন গুণিতেছে। তাহার স্বামীর সে একমাত্র পত্নী। যদি স্বামীর বহুপত্নী থাকে সে স্বামীর বিরহটা তত লাগে না, কিন্তু যদি স্বামীর আর না থাকে ? পত্নীর ত আর নাইই, তবে সে পত্নীর আশা বড় আশা। সুতরাং সে মরিবে না। দেখিবে সে মরে নাই। তোমার যাত্রা বিফল হইবেনা। তোমার সে ভ্রাতৃজায়া মরে নাই। সেকি মরিতে পারে ? এখনও যে মিলনের আশা আছে। সেকি মরিতে পারে ? 'বোঁটায় যেমন ফুলটী আটকাইয়া রাখে, সেইরূপ আশায় রমণীহৃদয় আটকাইয়া রাখে। বোঁটাটী শুকাইলে যেমন ফুলটী ঝরিয়া পড়ে, আশা ফুরাইলে রমণীর প্রাণ কর্পূরের মত উপিয়া যায়।

"পথ যে বড় দূর, বড় দুর্গম, একাকী এত পথ যাওয়া যায় কি গা ?" এ কথা মনে ভাবিও না। 'তোমার

গর্জ্জনে কাণ জুড়াইয়া যায়, সেই গর্জ্জনে মাটী ফুঁড়িয়া ভূঁইচাঁপার ফুল বাহির হয়, বড় সুলক্ষণ পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। সুতরাং পৃথিবী তোমার অনুকূল। পথ দুর্গম হইবে না। আর তোমায় দেখিয়া মানসসরোবরে যাইবার জন্য হংসগুলা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইবে, তাহারা পথে মৃণালের টুক্‌রা মুখে করিয়া কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত অর্থাৎ তুমি যত দূর যাইবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তোমার পয়সা খরচ করিয়া লোক লইতে হইবে না, তোমার সবদিকেই সুবিধা, আর দেরি নয়।

এখন চট্‌পট্‌ এই শৈলরাজকে আলিঙ্গন করিয়া উহার নিকট বিদায় গ্রহণ কর। এ তোমার পরম মিত্র, তোমায় অনেক দিনের পর দেখিলে উহার তাপ দূর হয়; তাই পর্ব্বত-গাত্র হইতে ভাব উঠে। আর তোমার শরীরস্পর্শে উহার স্নেহ প্রকাশ হয়, তাই পর্ব্বতগাত্রে শিশিরের ন্যায় জলবিন্দু দেখা যায়। উহাকে আলিঙ্গন করিলে তোমার শরীর পবিত্র হইবে। কারণ তোমার বন্ধু বড় যে সে লোক নয়; উহার প্রতি নিতম্বে প্রতিমেখলায় জগৎপাবন রামচন্দ্রের জগৎপাবন পদচিহ্নসমূহ বিরাজ করিতেছে।

এই পর্ব্বতটী সরগুজারাজ্যের মধ্যে। উহা একটী ক্ষুদ্র সমতল হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। উহার মাথায় শিখর আছে। শিখরে অনেকটা সমতল ভূমি। যেখান হইতে শিখরটী উঠিয়াছে, তাহার চারিদিকে

পর্ব্বতের নিতম্ব। ইহাতে উঠিবার জন্য তিন দিক হইতে পথ আছে। উত্তরের পথটী প্রশস্ত, পশ্চিমেরটী বড়ই খাড়াই। পূর্ব্বের দিকে আরও একটী আছে। সে নিম্নস্থিত ক্ষুদ্র সমতলে নানাস্থানে আশ্রম ছিল। প্রায় সকল আশ্রমেই রামচন্দ্র কখন না কখন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যক্ষ বেচারা যে কোথায় থাকিত তাহার ঠিকানা নাই। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যেদিন সে প্রথম মেঘ দেখিয়া পাগলপারা হইয়া যায়, সেদিন বৈকাল বেলায় সে পাহাড়ের দক্ষিণে এবং একটু দক্ষিণপূর্ব্বে—একটু দূরে উত্তরদিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। রেলগাড়ী চলিয়া গিয়াছে, আর ধূমাও দেখা যায় না। তবুও যেমন স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া সেই দিকেই চাহিয়া থাকে, সেইরূপ যক্ষ বেচারা অলকা দূরে হইলেও, দেখা যাবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, সর্ব্বদাই উত্তরমুখে সেই দিকেই চাহিয়া থাকিত।

যক্ষ বলিতেছে। তাহার পর শোন, রাস্তা বাৎলিয়া দিতেছি, শোন। যে সে রাস্তায় ত তুমি যাইতে পারিবে না, যেখানে পাহাড় পর্ব্বত বেশী, যেখানে উচ উচ পাহাড়, সেখানে ত তুমি ঠেকিয়া যাইবে। প্রশস্ত পথ না পাইলে তোমার বিশাল বপু ত চলিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি কোথাও খাড়াখাড়া যাইতে পারিবে না; তোমায় বাঁকিয়া চুরিয়া যাইতে হইবে। বিশেষ এখন তুমি জলভরা।

শরতের মেঘের মত খুব উচ্চে উঠিতে পারিবে না। তোমায় ২।৩ হাজার ফুটের মধ্যেই উড়িতে হইবে। সুতরাং অনেক ছোট পাহাড়েও তোমার বাধিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তাই বলিতেছি, তোমার যাবার মত রাস্তা তোমায় বাৎলাইয়া দিতেছি। তাহার পর তোমায় আমার সখীসংবাদ শুনাইয়া দিব ; তোমার কাণ ভরিয়া যাইবে, কাণ জুড়াইয়া যাইবে। তুমি যখন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, পর্ব্বতের মস্তকে বিশ্রাম করিয়া যাইও। যখন বড় কাহিল হইয়া পড়িবে, স্রোতের জল পান করিও। সে জল অতি লঘু, শীঘ্র হজম হইয়া যাইবে ; সুতরাং শরীর ভার হইবে না। তুমি যখন সাঁ সাঁ করিয়া উত্তরমুখে চলিবে, তখন সরল-স্বভাব সিদ্ধকন্যারা শিহরিয়া উঠিয়া আগ্রহের সহিত দেখিতে থাকিবে। কারণ, তাহাদের হঠাৎ মনে হইবে যেন বাতাস পর্ব্বতশৃঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, হিমালয়ের পাদদেশবর্ত্তী বনরাজী ও বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণপাদস্থ বনরাজী সিদ্ধগণের নিবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। লোকের এখনও বিশ্বাস, অনেক সিদ্ধ পুরুষ এখনও এই সকল অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহারা তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধনামক দেব-যোনিতে পরিণত হইয়াছেন। তাই উঁহাদের অঙ্গনা আছে, পরিবার আছে ; নচেৎ তপঃসিদ্ধের পরিবার কিরূপে হইবে? এস্থানের বেতগাছ দেখিতে বড় সুন্দর। তুমি এখান হইতে

উত্তরমুখে আকাশে উঠ গিয়া। দিঙনাগেরা তোমার গায়ে শুঁড় বুলাইতে আসিলে, সেখান হইতে সরিয়া পড়িবে। মল্লিনাথ এইখানে নিচুল ও দিঙনাগনামে দুইজন পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিচুল কালিদাসের পক্ষপাতী এবং দিঙনাগ অতিবিরোধী। তাঁহার মতে উভয়েই কালিদাসের সমকালীন, তাই তিনি নিচুল বেতগাছকে নিচুল কবি, আর দিঙনাগকে দিঙনাগ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। এবং তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া লোকে কালিদাসকে দিঙনাগ নামক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর সমকালীন ও ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসী দিঙনাগের বাড়ী কাঞ্চী, মেঘ উড়িতেছে রামগিরি হইতে। রামগিরি সরগুজার অন্তর্গত রামগড়, সুতরাং কাঞ্চীর দিঙনাগ মেঘের গায়ে শুঁড় বুলাইবে কিরূপে? কাঞ্চী রামগড় হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণে। এ দিঙনাগ সমূহের সঙ্গে সে দিঙনাগের কোনও সম্পর্ক আছে বোধ হয় না। আর যদিই হয়, এ দিঙনাগ ও বৌদ্ধ দিঙনাগ এক ব্যক্তি, ইহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। মনে করি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া প্রত্নতত্ত্বের কচ্‌কচি তুলিব না, কিন্তু ক্রনিক রোগ; না তুলিয়া থাকিতে পারি না।

ঐ দেখ ঐ বল্মীকের অগ্রভাগ হইতে ইন্দ্রধনু উঠিতেছে। পর্ব্বতে ইন্দ্রধনু অনেক নীচু পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় যেন একটা কোন অল্প উচ্চ জায়গা—উইএর ঢিপি হইতে উঠিতেছে। বোধ হইতেছে যেন নানাবিধ

মণিমাণিক্যের রশ্মি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধনুকের আকার হইয়াছে। ঐ ধনু যখন তোমার মাথায় লাগিবে, বোধ হইবে যেন চিকণ কালার চূড়ায় ময়ূরের পেথম নাচিতেছে।

এখানে একটু বিশেষ কথা আছে। বৈকালবেলা রাম-ধনু উঠিতে পূর্ব্বদিকে উঠিবে। উত্তরায়ণ—একটু দক্ষিণে হেলিয়া উঠিবে। মেঘ যখন মলয়-মারুত-তাড়িত হইয়া উত্তরে যাইতে থাকিবে তখন একবার না একবার ঐ বাঁকা ধনুর আগা তাহার মাথায় ঠেকিবে। তখন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামের মাথায় ময়ূরের পেখমের মত নিশ্চয়ই দেখাইবে। কারণ সে পেথম সবাই জানে—তেড়া করিয়া বসান ও বামে হেলা। উত্তরগামী মেঘের মাথায় রামধনু তেমনি তেড়া করিয়া বসান। তফাৎ কেবল এটা ডাইনে হেলা।

সকলেই জানে বৃষ্টি নহিলে চাস হয় না। বৃষ্টি তোমার আয়ত্ত, তাই তুমি উঠিলে যত পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা তোমার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। তাহাদের সে দৃষ্টিতে হাব নাই, ভাব নাই, চাতুর্য্য নাই, বিলাস নাই, বিভ্রম নাই, আছে কেবল প্রাণ কেড়ে নেওয়া প্রীতি আর চোখ জুড়ান মধুরিমা। তাহাদের এতই আগ্রহ, এমনি সরলতা, আর হৃদয়ের এতই আবেগ যে, বোধ হয় যেন তাহারা তোমাকে পানই করিয়া ফেলিবে। এইভাবে তুমি উঁচু চসা ভূঁয়ের উপর উঠিবে। নীচু জমীর উপর হইতে পাহাড় উঠে। খানিক পাহাড় উঠিলে তাহার উপর

সময়ে সময়ে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমি হয়। উহার নাম মালভূমি। অনেক মালভূমি আছে বলিয়া ভারতের অনেক প্রদেশের নাম মালব। মালভূমি সূর্য্যের আতপে বড়ই তাপিত হয়, তাই চাস করিবার পর এক আছড়া জল হইলে একটা খুব সোঁদা গন্ধ বাহির হয়। তুমি সেই গন্ধ সুঁকিতে সুঁকিতে সেই মালভূমির উপর দিয়া খানিক পশ্চিমদিকে যাও তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইও।

এইখানে কালিদাস একটু চাতুরী খেলিলেন। মেঘকে খানিকটা পশ্চিমমুখে পাঠাইলেন। কারণ মেঘ যদি বরাবর রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যায়, সে আবার সেই গঙ্গাযমুনা সঙ্গম দিয়া অযোধ্যা দিয়া যাইবে, সুতরাং রঘুবংশের ত্রয়োদশে যে পথে পুষ্পক রথ গিয়াছিল, মেঘকেও সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে। কবির প্রিয়ভূমি সকল দেখান হইবে না। তাই কবি কৌশল করিয়া উচু জমীর উপর দিয়া মেঘকে খানিকটা পশ্চিমদিকে সরাইয়া দিলেন। পথটা একটু তেরছা হইল কিন্তু কবির নূতন জগৎ দেখাইবার বড় সুবিধা হইল। কবি ইহার পর উজ্জয়িনী দেখাইবার জন্য পথটা আরও তেরছা করিয়াছেন।

অথবা রামগিরির আকার ও অবস্থান দেখিলে দেখা যাইবে যে উহা একটা ক্ষুদ্র সমতল হইতে উঠিয়াছে, ঐ ক্ষুদ্র সমতলের উত্তরপূর্ব্ব ও পশ্চিমে ধনুরাকারে অভ্রভেদিনী পর্ব্বতমালা। রামগিরিকে আলিঙ্গন করিয়া উত্তরমুখে

উঠিতে গেলেই মেঘ মহাশয় এই ধনুরাকার পর্ব্বতে বাধিয়া যাইবেন, তাই কালিদাস বলিয়াছেন উত্তরমুখ উঠিয়াই একটু পিছু হঠিয়া যাইবে, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইবে। কিন্তু এবারও অভ্রভেদী পর্ব্বত। দক্ষিণ হইতে বাতাস মেঘকে উত্তরদিকে ঠেলিলে পাহাড়ে বাধা পাইয়া মেঘ পশ্চিমে যাইবে। এইরূপভাবে উত্তরমুখে যাইতে গেলেই এই মালভূমি উঠিতে গেলেই—মালবদেশে প্রবেশ করিতে গেলেই—প্রথমেই আম্রকূট পর্ব্বত—এখনকার অমরকণ্টক। এই বিস্তৃত পর্ব্বতের একটীমাত্র উচ্চ শিখর। পর্ব্বতটী অনেক দূর লইয়া মোচাগ্র আকারে উঠিয়াছে; ইহার এক দিক দিয়া নর্ম্মদা আর এক দিক দিয়া মহানদী ও আর একদিক দিয়া শোণনদী প্রবাহিত হইতেছে। অনেক দূর লইয়া থর করিয়া মোচাগ্র আকারে আম্রকূটের উচ্চ শৃঙ্গ উঠিয়াছে। সে তোমার কাছে বড় ঋণী, তাহার বন যখন দাবানলে পুড়িতে থাকে, তখন তুমিই ধারাবৃষ্টি করিয়া সে দাহ নিবারণ করিয়া থাক। তাই তোমার কথা মনে হইলে তাহার আনন্দ হয়। সে নিশ্চয় তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবে। এক সময়ে তুমি তাহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ; এখন তুমি যদি পথক্লান্ত হইয়া তাহার নিকট আশ্রয় চাও—সেত আর ছোট লোক নয়—তাহার মস্তক উন্নত—সে এমন কাজ কখন করিবে না; যাহাতে উচ্চ মাথা হেঁট হয়। সে অবশ্যই তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবে। সেই মোচাগ্র আকার উত্তুঙ্গ পর্ব্বত চূড়ার উপর

তুমি বসিবে। তোমার আকার যেন একটী তেলে কুচ্‌কুচে কালখোঁপা। শিংদার ফিরিঙ্গী খোঁপা নয়, দিশি—সেকেলে—মাথার মাঝখানে থাকা—নীচে মোটা, উপরে সরু, ঘন, কৃষ্ণকাল খোঁপা। তোমার নীচে মোচাগ্র আকার প্রকাণ্ড বিস্তার পর্ব্বত শিখর, অনেক জমি ব্যাপিয়া আছে, আর রাশি রাশি বনের আম পাকিয়া পর্ব্বতের বাহির দিকটা পাকা আমের রঙে রঙ করিয়া তুলিয়াছে। পাকা আমের রঙে আর রমণী শরীরের দুধে আলতা রঙে প্রভেদ আছে কি ? কিছুই নাই। এখন ভাব দেখি, দুধে আলতার রঙের সেই প্রকাণ্ড মোচাগ্র আকার পাহাড়টীর উপর, কাল মেঘ খোঁপার মত হইয়া বসিলে, উপর হইতে দেবতারা যখন যুগলমিলনে মিলিত হইয়া দেখিবে ; তখন উহা পৃথিবীর কিসের মত দেখিবে।

সে পর্ব্বত আগাগোড়া গাছ পালায় ঢাকা—অনেক জায়গায় কুঞ্জবন আছে, আর সে নির্জ্জন নিভৃত কুঞ্জগুলি বনবাসিনীদের আনন্দের স্থান। তুমি তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবে, অনেক জল বর্ষণ করিয়া দিবে, একটু হালকী হইবে ; শীঘ্র শীঘ্র খানিক দূর গিয়া দেখিবে নর্ম্মদা নদী। মনের উৎকট আবেগে রোগা হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কি উৎকট অবস্থা ! বিন্ধ্যের পা গুলা কি যেমন তেমন পা, পাহাড়ে, পাথরে, ডেলায়, ডুমরিতে এবড় খেবড়। যেন কোন গোদা মিন্সের পায়ে ধরিয়া নর্ম্মদা আলুথালু ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নে

স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণা নর্ম্মদা, উপরে কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ অবস্থিত বনরাজিবিরাজিত বিন্ধ্যপর্ব্বত। মাঝে মাঝে সাদা ঝরণা পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া নর্ম্মদায় পড়িতেছে, উপর হইতে বোধ হইতেছে যেন একটা হাতীর শিঙার হইয়াছে। বড় বড় সাদা সাদা লাল লাল কাল কাল ডোরা দেওয়া হাতীর শিঙার যিনি দেখিয়াছেন তিনিই এ উপমার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।

তুমি জল ঢালিয়া নর্ম্মদার জল লইয়া প্রস্থান করিবে। এই খানে জাম গাছের নিবিড় বন। জলের বেগ জাম গাছের ঝাড়িতে ঝাড়িতে আটকাইতেছে। গাছে গাছে লাফাইয়া পড়িতেছে, আর মলা কাটিয়া হাল্‌কা হইতেছে। বিন্ধ্যপর্ব্বত গজের আকর অর্থাৎ হাতীখেদার একটা প্রধান স্থান। পালে পালে হাতী পড়িয়া নর্ম্মদার জলকে তাহাদের মদজলে সুরভি করিয়া তুলিয়াছে। তুমি ঐ জল পেট পুরিয়া লইও, তাহা হইলে বায়ু তোমায় তুলার মত উড়াইয়া দিতে পারিবে না। খালি হইলেই লঘু হয়, পূরা হইলেই ভারি হয়। তুমি জল পূরিয়া ভারি হইও। কথাগুলি সংস্কৃতে এমনি করিয়া সাজান আছে যে উহার ভিতরে ভিতরে আর একটা অর্থ রহিয়া গিয়াছে। যদি রোগীকে বমন করাইয়া তাহাকে লঘু তিক্ত কষায় জল খাওয়ান যায় এবং ক্রমে তাহার বলাধান হয় তাহা হইলে বাতে তাহার কাঁপনি জন্মাইয়া দিতে পারে না।

তুমি যেখানে যেখানে যাইবে কদম্বফুল ফুটিবে। কদম্ব-গোলের গাত্রস্থিত অসংখ্য কুঁড়িগুলি ফাটিয়া কেশর বাহির হইতে থাকিবে, কতক বাহির হইয়াছে কতক হয় নাই। এরূপ অবস্থায় উহার বিচিত্র বর্ণ বিকাশ হইবে। খানিকটা কাঁচা সুতরাং সবুজ, খানিকটা পাকা, সুতরাং পাঁশুটে, উভয়ের মিশ্রণে কি বিচিত্র শোভাই হইয়া উঠিবে। তুমি যেখানে যেখানে যাইবে দেখিবে জলাভূমে ভূঁইচাপার প্রথম কুঁড়িগুলি বাহির হইতেছে, আর তুমি যেখানে যেখানে যাইবে ভূমি হইতে বিচিত্র সোঁদা গন্ধ বাহির হইবে। হরিণগুলি কদম্বফুল দেখিয়া, ভূঁইচাপার ফুল খাইয়া, ও সোঁদা গন্ধ শুঁকিয়া, মদভরে লম্ফঝম্ফ করিবে আর লোককে দেখাইয়া দিবে এই পথে তুমি বৃষ্টি করিয়া গিয়াছ।

হে সখে, তুমি আমার প্রিয়ার জন্য যাইতেছ। আমার প্রাণও আকুল হইয়াছে আর দেরি সয় না। তথাপি আমি দেখিতেছি যে প্রতিপর্ব্বতেই তোমার বিলম্ব হইবে। কুরচিফুল তোমার বড় প্রিয়। পর্ব্বতগুলি টাটকা ফোটা কুরচির গন্ধে ভর ভর করিতেছে, তুমি নিশ্চয়ই একটু গড়িমাসি করিবে; তাহার উপর আবার যখন ময়ূরেরা তাহাদের শ্বেতবর্ণ নয়নপ্রান্ত ঘুরাইয়া সজলনয়নে কেকা উচ্চারণ করিয়া তোমার সম্বর্দ্ধনা করিবে; প্রাণের বঁধু, এসহে এসহে বলিয়া তোমায় আগু বাড়াইয়া লইতে আসিবে; আহা

যাহারা তোমার সাড়া পাইলে নাচিয়া উঠে তাহারা যখন প্রাণ খুলিয়া ডাকিবে, তোমার সাধ্য কি যে তুমি চট্‌পট্‌ তাহাদের ছাড়িয়া যাও।

তুমি অধিষ্ঠান হইলে দশার্ণ দেশ অর্থাৎ পূর্ব্ব মালবের কি সুন্দর অবস্থা হইবে জান কি ? উহার প্রান্তদেশে নিবিড় জাম গাছের বন। তোমার আগমনে জামের ফল সব একেবারে পাকিয়া উঠিবে, গাঢ় সবুজ জামের পাতা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জামের ছাল, তাহার উপর কুচকুচে কাল রাশি রাশি ফল, কালয় সবুজে কালয় কালয় কালতর কালতম হইয়া উঠিবে। মালব দেশ ভারতের বাগান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান, বেড়ায় কেবল কেয়াফুলের গাছ, তুমি গেলে কেয়াফুলের কুঁড়ি গুলির ডগার কাঁটা ছাড়িবে। পাপড়ি ছাড়িতে এখনও দেরি আছে, রাশি রাশি ফুল, কেবল সাদা, যে টুকু ফুটিয়াছে তাহাও সাদা ; আবার সাদায় সাদায় সাদা হইয়া যাইবে। তুমি গেলে কাককুল বড় বড় গাছের আগায় বাসা করিতে থাকিবে, আর তাহাদের কলরবে গাছটা শুদ্ধ কলরবময় হইয়া উঠিবে। তুমি তথায় গেলে তোমার সঙ্গে যে হাঁসগুলা মানস সরোবরে যাইতেছিল তাহারা দশার্ণ-দেশে কয়েক দিন থাকিয়া যাইবে।

দশার্ণের রাজধানী বিদিশা। উহার যশে ভুবন ভরিয়া আছে। তুমি বিলাসী ; তুমি সেখানে গেলে তোমার বিলাস বাসনা সফল হইবে ; তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কারণ

তুমি তথায় বেত্রবতীর জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। বেত্রবতী নদী, সুতরাং তোমার রসরঙ্গিণী; সে বিদিশার পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; উহার জল চলিতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে লাফাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন কোন প্রৌঢ়া কামিনী মুখে ভ্রূভঙ্গি করিয়া তোমায় ডাকিতেছে। সুতরাং সে জল পান তোমার মুখে চুম্বনের ফল হইবে। সুধু কি তাই কেবল, জল গভীর নদীগর্ভে পার্শ্বস্থ উপলে গভীর নাদে আছড়াইয়া পড়িতেছে, দূর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনী আবেগ ভরে না আ আ না আ আ এই অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিয়া "আশা পূরে নাই আশা পূরে নাই" এই কথা বলিয়া দিতেছে। ভ্রূভঙ্গির সহিত গিরিনদীর তরঙ্গের তুলনা কি মধুর! ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, প্রসারিত হয়, কাঁপে, তরঙ্গের আকারও কোথাও প্রশস্ত কোথাও কুঞ্চিত কোথাও বা নর্ত্তিত হয়।

সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ নামে সহরতলীর পাহাড়ে বাসা লইও। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে তাহার পুলক কদম্বফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টী কূর্ম্মপৃষ্ঠ ৩০০।৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইহা বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ স্তূপ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে এককালে মণ্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাথর দিয়া গাঁথা এক একটা খালি ঘর নির্জ্জনে পড়িয়া থাকিত। এরূপ নগরের বাহিরে নির্জ্জন ঘর দেখিতে চাও, হিমালয়ের

সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। ও ঘরে কি হয়?—এমন কিছু নয়—একটা ঢেটরা হয়। কিসের ঢেটরা—এই কথা যে, নগরবাসীদের যৌবন দড়ি ছেঁড়ে—স্মৃতির লাগামে, ধর্ম্মের বন্ধনে, উপদেশের নাগপাশে, আর বাঁধা থাকে না। মিথ্যা কথা; নির্জ্জন ঘর ঢেটরা দিতেছে—সৎপ্রতিপক্ষ বাক্য—(Contradiction in terms)। দূর মূর্খ দেখিতেছিস্না—নাক কি নাই? ও কিসের গন্ধ? ও যে পরিমল,—চটকান ফুলের গন্ধ—ঐ ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে—বুঝিতেছিস্ না কে ঐ ফুল চটকাইল—কখন চটকাইল, কেমন করিয়া চট্‌কাইল—যদি না বুঝিয়া থাকিস যা—তোর মেঘদূত পড়িতে হইবে না।

নাচু পাহাড়ে একটু বিশ্রাম করিবে। তাহার পর আবার চলিতে থাকিবে। ছোট নদীটা, ধারে ধারে বড় বড় ফুল বাগান কেবল যুঁই ফুলের গাছ; কত ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফোটাফুলে দুএক আছড়া টাটকা জল দিবে। সেখানে তোমার অনেকের সঙ্গে আলাপ হইবে। তুমি যেমন লোক তেমনি লোকের সঙ্গে আলাপ হইবে। রসিকারা ফুল তুলিতেছেন—গাল বহিয়া ঘাম পড়িতেছে—আঁচল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। মুছিবার কিছুই নাই, তাই কান হতে যে পদ্মের কুণ্ডল ঝুলিতেছিল তাই দিয়া ঘাম মুছা হইতেছে, আর পদ্মটী মলিন হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় তোমার দেহের নীচে যদি তাহারা একটু ছায়া পায়, আনন্দ-বিস্ফারিত-নেত্রে

মুখ উচা করিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তোমায় দেখিবে। সেই নিষ্কলঙ্ক মুখের সঙ্গে তোমার খানিক আলাপ হইবে।

তুমি উত্তর দিকে চলিয়াছ। উজ্জয়িনী বিদিশা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম। সুতরাং উজ্জয়িনী যাইতে হইলে তোমায় বাঁকিয়া যাইতে হইবে। তথাপি আমার অনুরোধ—আমারই কাজে তুমি যাইতেছ— উজ্জয়িনী না দেখিয়া যাইও না। উহার অট্টালিকার ক্রোড়ে না বিশ্রাম করিয়া যাইও না। তুমি যখন উপর দিয়া যাইবে, অট্টালিকার উপর গুলি—ছাদ গুলি—ক্রোড়গুলি তোমায় ডাকিবে। তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইও। উজ্জয়িনীর পুরবাসিনীগণের নয়ন বড়ই মনোহর। উহাদের অপাঙ্গ নিরন্তর চঞ্চল,চোখের কোলে নৃত্য যেন লেগেই আছে। সে নৃত্যের চাঞ্চল্যই বা কত? তার কাছে বিদ্যুতের খেলা কোথায় লাগে। তাদের সেই বিদ্যুদ্বিলাসি নয়নের সঙ্গে যদি খেলা খানিক না করিতে পারিলে, তবে তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইলে—আত্মবঞ্চনা করিলে—জন্মটা বিফলে গেল।

বিদিশা হইতে একটু পশ্চিমে নির্ব্বিবন্ধ্যা। কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরমুখে চম্বলে পড়িতেছে। নদীর খোলা ঢালুজমীর বশে যাইতেছে। দক্ষিণে উঁচা যত উত্তরে যাইতেছে ততই নীচু হইতেছে। নদীটী গিরিনদী, খাদটী বড় বড় পাথরে ভরা। স্রোতের জল যেন পাথরে পাথরে হোঁছট খাইয়া পড়িতেছে। যেখানে

পাঁথর নাই জল গভীর স্থিরভাবে চলিতেছে তাহার মাঝে মাঝে ঘোল হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন বিলাসিনী তোমায় নাভি দেখাইতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রে নাভি দেখান নিষেধ। নির্ব্বিন্ধ্যা বড় বেহায়া, তাই নাভি দেখাইতেছে; হোঁচট খাইয়া পড়িতেছে; আর কি করিতেছে জান? চন্দ্রহার ছড়াটা ঝম্‌ঝম্ করিযা নাড়িতেছে। ও চন্দ্রহার পাইল কোথায়? কেন ঐ যে হাঁসগুলা সারিদিয়া পার হইয়া যাইতেছিল, তাহার সারিটী কেমন বাঁকিয়া চন্দ্রহারের মত অর্দ্ধবৃত্তাকার হইয়া পড়িয়াছে দেখিতেছ না? স্রোতের মুখে কি ও সার ঠিক থাকে। তাহার পর আবার স্রোতের যত ধাক্কা লাগিতেছে, তত‌ই হাঁসগুলা প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া খাদে শব্দ করিতেছে। চন্দ্রহারের শব্দটী কি ঐ রকম নয়! নির্ব্বিন্ধ্যা যথন তোমার জন্য এত পাগলিনী তখন তোমার উহাকে বঞ্চিত করা কি উচিত! যদি বল নির্ব্বিন্ধ্যা আমায় ডাকে কই—আমি বলি ঐ যে অত রঙ্গভঙ্গী—ওকি ডাক নয়?

স্ত্রীলোকে যাহাকে কামনা করে সংস্কৃতে তাহাকে সুভগ বলে অর্থাৎ ladies' man. হে মেঘ তুমি বড় সুভগ—সকল নদীই তোমায় কামনা করে। ঐ দেখ—সিন্ধু কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া ঠিক সোজা খাড়া খাড়া উত্তরমুখে গিয়া চম্বলে পড়িতেছে। তোমার বিরহে বেচারা রোগা হইয়া গিয়াছে, একটী সরু জলধারামাত্র আছে।

এপাশ হইতে দেখিতেছ না উহা ক্রমে আরও সরু, আরও সরু, আরও সরু হইয়া একটা চুলের বিননীর মত হইয়া শেষে মিলাইয়া গিয়াছে। বিরহে বেচারা পাংশুস হইয়া গিয়াছে—তীরতরু সমূহের যত রাজ্যের শুকনা পাতা চড়ায় পড়িয়া আছে, বোধ হইতেছে নদীটাই বিরহে পাংশুস হইয়া গিয়াছে—তোমারই সৌভাগ্য। যাহার বিরহে রমণী এত কাতরা তাহার চেয়ে সুভগ আর কে? দেখ সে কত প্রতিপ্রাণা; এখন সে বেচারার ক্ষীণতা যাহাতে ঘুচে; সেটা করিয়া দাও—সেত তোমারই হাত।

সিন্ধুনদী পার হইয়াই অবন্তী। সেখানে সকলেই বৃহৎকথা পড়িয়াছে। গ্রামবৃদ্ধেরা বৃহৎকথার গল্প—উদয়নের গল্প লইয়া দিনযামিনী যাপন করে। অবন্তীর রাজধানী বিশালা বা উজ্জয়িনী। এত সম্পদ আর কোথাও নাই। পূর্ব্বেই তোমায় বলা আছে, তুমি উজ্জয়িনী যাও। সেত পার্থিব নগর নয়—সে যে স্বর্গের একটা খণ্ড—বড় শোভাময় খণ্ড—স্বর্গের খণ্ড পৃথিবীতে আসিল কিরূপে? যে সকল স্বর্গবাসী লোক পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাঁহাদের যে পুণ্যটুকু এখনও ক্ষয় হয় নাই সেই পুণ্যটুকুর জোরে ঐ স্বর্গটুকু পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

সেখানে রমণীরা কেলিলীলায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শীতলস্পর্শ শিপ্রানদীর বায়ু তাহাদের ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়। শিপ্রাবায়ু ফুটন্ত পদ্ম হইতে সৌরভ গায়ে মাখিয়া

সুরভি হইয়া উঠে, আর সারসেরা সরোবরে যে অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতে থাকে সে ধ্বনিকে অনেক দূরে লইয়া যায়; অনেক দীর্ঘ করিয়া দেয়। শিপ্রাবাত যে কার্য্য করে দেয়, তাহা আবার একজন মাত্র করিতে পারে সে কে? প্রিয়তম। তিনি কি করিয়া ক্লান্তিদূর করেন, প্রথম অঙ্গানুকূল কার্য্য করিয়া অর্থাৎ গা হাত পা টিপিয়া আর দলিত পুষ্পের পরিমল শুঁকাইয়া এবং অনেক মন জোগান কথা কহিয়া অনেক মনরাখা কথা—কহিয়া সেকথাও এত লম্বা ও এত মিষ্ট যে কোথায় লাগে সারসের কূজন তাহার কাছে? তাঁহার এত খোসামোদের দরকার? এত ক্লান্তি ত তাঁহারই পূজায়, আবার খোসামোদ কেন?—ভবিষ্যতের আশায়—সেও বেশী দূর ভবিষ্যৎ নয় !!!

উজ্জয়িনী গেলে তোমার অনেক উপকার। রমণীরা ধূপ জ্বালাইয়া চুলে বাস দিবে, আর সেই ধূপের ধুঁয়া জানলা দিয়া বাহির হইয়া তোমার গায়ে লাগিবে ও তোমার দেহ পুষ্ট করিয়া দিবে। নিজের দেহটা স্বচ্ছন্দ হবে, Waltairএ যাইতে হইবে না। সেখানে বাড়ী বাড়ী তোমার অনেক বন্ধু আছে; তাহারা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তোমার সম্মানার্থ নৃত্য করিবে। যেমন বড় লোক আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ বাইনাচ হয়, তোমার জন্য সেইরূপ ময়ূরনাচ হইবে। দেখিবে উজ্জয়িনীর বড় বড় বাড়ীর কত শোভা—

ফুলের গন্ধে সব ভর—আর সব বাড়ীতেই স্সুন্দরীদের আলতাপরা পায়ের দাগ—বোধ হয় যেন লক্ষ্মী পূজার দিনে বাড়ীময় লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পায়ের দাগ দেওয়া রহিয়াছে।

উজ্জয়িনীতে গন্ধবতী নদীর তীরে মহাকালের মন্দির। তুমি যখন সেখানে যাইবে, মহাদেবের প্রমথগণ একদৃষ্টে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে। কারণ তাহারা তোমার কুচকুচে কালরঙে মহাদেবের গলার শোভা দেখিতে পাইবে। তাই এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। মন্দির-সংলগ্ন একটী প্রকাণ্ড ফুল বাগান। গন্ধবতীর বায়ু পদ্মের গন্ধ মাখিয়া, পদ্মের রজ সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত করিয়া, আর যুবতীরা যে গন্ধতৈল মাখিয়া নাহিতেছেন তাহার গন্ধ অপহরণ করিয়া, বাগানের প্রত্যেক ফুলগাছ—প্রত্যেক লতা কাঁপাইতেছে।

হে জলধর, যদি অন্য সময়েও মহাকালের মন্দিরে উপস্থিত হও; তাহা হইলেও সূর্য্যদেব যতক্ষণ না অস্তাচলে যান; ততক্ষণ তোমার প্রতীক্ষা করা উচিত; কারণ আরতির সময় মেঘগর্জ্জন "হইলে তাহাতে আরতির ঢাকের কার্য্য করিবে। তোমার গর্জ্জন করা সার্থক হইবে।

আরতির সময় বেশ্যারা চামর ঢুলায়। তালে তালে তাহাদের পা নড়ে, তাহাদের চন্দ্রহারে ঝুন্ ঝুন্ শব্দ হয়। তাহাদের গহনার মণিমাণিক্যের শোভায় চামরের মণি-বসান ডাঁটা ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। কিন্তু

শেষ পর—স্ত্রীলোক ত—সুকুমার দেহ ত—খানিক চামর ঢুলাইলেই তাহাদের হাত ঝিমাইয়া আসে। যে হাতে রাত্রের নখের দাগ এখন একটু একটু চিড়্ চিড়্ করিতেছে, সেই হাত অবশ হইয়া আসে। সেই সময়ে—সেই মাহেন্দ্রযোগে—তুমি যদি সেই চিড়চিড় করা দাগের উপর দুফোঁটা টাটকা জল ফেলিয়া দিতে পার, তাহাদের শরীর জুড়াইয়া আসিবে। আর তাহারা, তুমি বড় রসিক বুঝিয়া আড়ে আড়ে আড় নয়নে তোমার দিকে চাহিতে থাকিবে। কাজল-পরা চোখের কোলে ঘোরাল কাল তারা দুইটী আসিয়া পড়িবে। প্রতি চাহনিতে বোধ হইবে একটা কাল ভোমরা বাহির হইয়া গেল; ক্রমে একটা দুইটা করিয়া এক সার ভোমরা সে চোখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই সন্ধ্যার সময় মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য করেন, একটা টাট্‌কামারা হাতীর ছাল লইয়া তিনি নৃত্য করেন। রক্তাক্ত দিক্‌টা নীচের দিকে থাকে, আর শুকনা পিট্‌টা উপর দিকে থাকে। তিনি চার হাত—চার হাতই বলি কেন—হিন্দু ভাস্করেরা ইচ্ছানুসারে ঠাকুরদের হাত জোড়া জোড়া বাড়াইয়া দিতে পারিত—মেলা হাত তুলিয়া সেই চামড়াখান লুফেন আর লাফান। এ নৃত্য পার্ব্বতীর চক্ষুঃশূল—হাজার হোক স্ত্রীলোক ত, অত রক্তারক্তি ব্যাপার তাঁহার বড়ই গর-পছন্দ। তাই বলিতেছিলাম, তুমি যদি পার্ব্বতীর প্রতি ভক্তি দেখাইতে চাও, তিনি স্নেহচক্ষে স্তিমিতনয়নে তোমায়

দেখিবেন, ইহা যদি তুমি চাও, তবে গর্জ্জন করিও না; ডাকডোক ছাড়িও না। নীচের দিকে টাটকাফোটা জবাফুলের মত সন্ধ্যাকালের লালরঙ মাখিয়া মন্দিরের সামনে থাকিও; মহাদেব হাতীর চাম না লইয়া তোমায় লইয়াই নৃত্য করিবেন, পার্ব্বতী তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবেন।

রাত্রি গভীর হইলে "শাট্যঞ্চলে বদনাবগুন্ঠিত" করে যথন মদনমনোমোহিনীরা নিজবাস পরিহার করত "প্রাণ-কান্তের নিকটাভিসারিকা" হতে থাক্‌বেন, যথন রাজপথ নিরেট অন্ধকারে আবৃত, এমনি নিরেট, যে ছুঁচ ফুটান যায়, তথন তুমি একটী কাজ করিও—তোমার সৌদামিনীকে একটু প্রকাশ করিও—তাহাকে চঞ্চলা চপলা হইতে বারণ করিও—সে যেন তোমার গায়ে কষ্ঠিপাথরে স্বর্ণরেখার ন্যায় খানিক নিশ্চল হইয়া থাকে। অভিসারিকারা যেন পথ দেখিয়া লইতে পারে। দেখিও—সে সময়ে জল ঢালিও না—সে সময়ে গুড়্ গুড়্ শব্দে ডাকিও না—তাহারা, তুমি ডাকিলে,—একে অবলা—তাহাতে আবার পাছে কেহ টের পায়, সেই ভয়েঁ সদাই চকিতা—ভয়ে একেবারে হতবুদ্ধি-দিশাহারা হইয়া যাইবে।

সৌদামিনী এরূপ দীর্ঘকাল প্রকাশ হওয়ায়, অনেকক্ষণ ঝিক্‌মিক্ করায়, ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন। আহা সে ত তোমার চিরসঙ্গিনী রমণী, তাকে ত একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। তাই বলি সে রাত্রিটা কোন উচা বাড়ীর চালে

শুইয়া কাটাইয়া দিও। ওখানে কেহ তোমায় বিরক্ত করিবে না; করার মধ্যে পায়রাগুলা, তা তাহারাও ঘুমাইয়া আছে। তাহার পর সূর্য্য দেখা দিলে পুনরায় বাকী পথটুকু চলিয়া যাইবে। বন্ধুর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ভদ্রলোক ত কখন চুপ করিয়া থাকে না।

দেখ, সূর্য্যদেব একটী বড় খারাপ কাজ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার প্রিয়রমণী নলিনীকে ফেলিয়া সারারাত কোথায় ছিলেন;—নলিনী বেচারা সারারাত কাঁদিয়া শিশিরের জলে ভরিয়া আছে। সকালবেলা অন্য লম্পট যেমন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দুই হাতে অভাগিনী বিবাহিতা পত্নীদের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া থাকে, আদর করে, সূর্য্যদেবও তেমনি আপনার সহস্রকরে নলিনার চোখের জল মুছাইতে আসিবেন। তিনি দেবতা, যেমন বুঝিবেন, তেমনি করিবেন, তুমি যেন মাঝে পড়িয়া তাহার কর রোধ করিওনা। তাহা হইলে সূর্য্যের সঙ্গে তোমার মিছামিছি ঝগড়া বাড়িয়া যাইবে।

এইবার গম্ভীরা নদী—জল কি স্বচ্ছ—তরতর করিতেছে; তলা দেখা যাইতেছে, যৌবনের প্রথম আরম্ভে ভাবুকের—কবির—প্রেমের প্রথম উদ্‌গমে প্রণয়িনী শকুন্তলার—হৃদয় এ জলের তুলনা পায় কি? তুমিত সুভগ—অঙ্গনার কামনার বস্তু, তুমি ছায়ারূপে একেবারে গম্ভীরার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিবে। সে দেখিবামাত্র তোমায় তাহার নির্ম্মল হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে। আর অতি চপল পুঁটিমাছগুলাকে

উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া লাফাইতে দিয়া তোমার প্রতি চঞ্চলকটাক্ষে চাহিতে থাকিবে ; এ কটাক্ষে কাল নাই ; কুমুদ ফুলের মত শাদা—সব শাদা ; এ কটাক্ষের অর্থ জান ত—দেখিও যেন এই সময় জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসিও না ; দেখিও তাহার সে উজ্জ্বল চক্ষের সে শাদা চাহনি নিষ্ফল করিও না।

হে সখে, তাহার খাদ অতি সরু ; তাহার খোলা প্রশস্ত ; খাদের জলের দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড বালির চড়া, আর পাড় খুব উচা ; পাড় হইতে ঘোরাল নীলরঙের বেতগাছ ঝুলিয়া বালির চড়ায় পড়িয়াছে ; একটু সম্মুখে উচ্চ হইতে চাহিয়া দেখিলে বোধ হইবে খোলার দুই পাড় ক্রমে সরু হইয়া শেষ মিলিয়া গিয়াছে ; খাদের দুই পাড়ও অল্পের মধ্যেই ক্রমেই সরু হইয়া মিলিয়া গিয়াছে—এখন চড়াটার আকার কিরূপ হইয়াছে বুঝিয়াছ কি ? আরও বলি, নদীটা কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিন্ধ্যের উপর হইতে উৎপন্ন হইয়া ঢালু জমীর উপর দিয়া নীচু মুখে চলিয়া যাইতেছে আর তুমি সেই বিন্ধ্যের উপর হইতে দেখিতেছ, বুঝিয়াছ কি চড়ার চেহারাটা কি রকম হইয়াছে ? তোমার নদী নায়িকা যেন তাহার পিছনের দিকে জলের নীলাম্বরি হাতদিয়া গুটাইয়া রাখিয়া তোমায় ডাকিতেছে ; আমার অদৃষ্ট মন্দ—আবার দেরি হইবে। তুমিকি ও অবস্থায় তাহাকে কি ছাড়িয়া যাইতে পারিবে ? তুমিত ঝুলিতে ঝুলিতে যাও—তুমি কি এ মাহেন্দ্র-যোগ ছাড়িতে পারিবে—ও যে ব্যানত রতি ; যত রতিবন্ধ

আছে সবার উৎকৃষ্ট ; রতিবন্ধের চরম আস্বাদ ; যে একবার ইহার আস্বাদ পাইয়াছে সেকি কখনও ওরূপ বিবৃতজঘনা বিলাসবতী কামিনীকে ছাড়িয়া যাইতে পারে? আমারই অদৃষ্ট মন্দ ;—দেরি হইয়া উঠিবে দেখিতেছি। হা ভগবান্!

দেবগিরি উজ্জয়িনী হইতে মান্দাশোর যাইবার পথে চম্বল নদের অবিদুরে একটী উচা পাহাড়। গম্ভীরার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তুমি যখন দেবগিরি যাইবে, তখন দারুণ গরম লুএর বাতাসের বদলে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকিবে। প্রথম জলের আছড়া পাইয়া পৃথিবী হইতে যে সোঁদা গন্ধ বাহির হইবে, বায়ু সে গন্ধ মাখিয়া মাতিয়া উঠিবে। হাতীগুলা গরমের চোটে অস্থির ; তাহাদের নাকের ভিতর গরমে জ্বলিয়া যাই-তেছে ; শুঁড় তুলিয়া ঘড় ঘড় করিয়া সেই প্রথম ঠাণ্ডা বাতাস টানতে থাকিবে, আর সেই ঠাণ্ডা বাতাসে সুদূর বিস্তীর্ণ যে যজ্ঞ ডুমুরের বন আছে, তাহার সব ফল পাকিয়া উঠিবে, ঠাণ্ডা মৃদু সুগন্ধে দেশ ভর হইয়া যাইবে। মগজ ভরিয়া যাইবে।

দেবগিরি কার্ত্তিকের চিরবাসস্থান। কার্ত্তিক বড় কম দেবতা নন ; সাক্ষাৎ মহাদেবের সন্তান। তুমি দেব গিরিতে গিয়া ফুলে ভরা মেঘ হইবে ; ফুলগুলি মন্দা-কিনীর জলে ভিজাইয়া লইবে আর শ্রাবণের ধারার ন্যায় সেই ফুলের ধারাবৃষ্টি করিয়া কার্ত্তিককে স্নান করাইয়া দিবে।

কার্ত্তিকের একটী ময়ূর আছে। তাহার মত ভাগ্য-

বান আর কি কেহ জগতে আছে? তাহার যদি একটা পাখ্‌না খসিয়া পড়িল—সেই চাঁদওয়ালা চকচকে পাখ্‌না যদি খসিয়া পড়িল পার্ব্বতী অমনি—আহা কার্ত্তিকের ময়ূরের পাখা—বলিয়া তাহা কুড়াইয়া পদ্মের সঙ্গে মিশাইয়া কানে তুলিয়া লইলেন। এত ভাগ্য এ ভূভারতে আর কার আছে? সুধু কি তাই—মহাদেব সে ময়ূরটিকে চখে চখে রাখেন, তাঁহার কপালের চাঁদের শাদা আলোয় তাহার শাদা চোখের একটা আশ্চর্য্য শোভা হয়। এমন যে ময়ূর, কার্ত্তিকের প্রিয়, শিবের প্রিয়, শিবার প্রিয়, তুমি তার—একটু নোটিস নিও। তুমি গর্জ্জন করিও, সে গর্জ্জন গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সে ময়ূর তালে তালে নাচিতে থাকিবে।

কার্ত্তিকের পূজা সারিয়া তুমি ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকিবে। সিদ্ধ সিদ্ধা যুগল মিলনে আকাশপথে বীণা বাজাইয়া গান করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা—, পাছে জল লাগিয়া তার বেসুরা মারিয়া যায়, তাই তোমার পথ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে।" তাহার পর তুমি চর্ম্মণ্বতীর মান রাখিবার জন্য ঝুলিয়া ঝুলিয়া নামিবে। চর্ম্মণ্বতী সামান্য নদী নহে। রন্তিদেব গোমেধযজ্ঞে এত গোবধ করিয়াছিলেন যে তাহাদের চামড়া হইতে ঝরিয়া পড়া রক্তে একটী নদী হয়; চর্ম্মণ্বতী—সেই নদী।

চর্ম্মণ্বতী প্রবাহ খুব বিস্তৃত; কিন্তু তথাপি উপর

হইতে—দূর হইতে—দেখিলে অতি ক্ষীণ দেখাইবে। দেখিবে কোথাও বড় বড় পাথরের পাশ দিয়া কড় কড় করিয়া জল যাইতেছে; কোথাও সড়াৎ করিয়া খানিকটা স্থির জল চলিয়া যাইতেছে। কোথাও একটু উপর হইতে পড়ায় ফেনময় হইয়া যাইতেছে। ফেন-রাশি উপর হইতে মুক্তার মত দেখাইতেছে—নদীটা একটা মুক্তার হারের মত দেখাইতেছে। তাহারই মাঝখানে তুমি যদি চিকণ কালার রঙ্ চুরি করিয়া জল খাইতে নাম, গগনচারী দেবগণ নীচের দিকে চাহিয়া দেখিবেন— যেন মুক্তার মালায় একখানা বড়নীলমণি বসান রহিয়াছে।

চর্ম্মণ্বতী পার হইয়া দশপুর, এখন উহার নাম মান্দা-শোর। দশপুর হইতে দশোর হইয়াছে। মহকুমাদশোর ক্রমে "মন্দ"অর্থাৎ সংক্ষেপ হইয়া মান্দাশোরে দাঁড়াইয়াছে। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা সাভিলাষ দৃষ্টিতে তোমায় দেখিবে। তাহাদের ভ্রূলতা সদাই কাঁপিতেছে—সে ভ্রূভঙ্গিতে কত হাব কত ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহারা উপর দিকে চাহিলে প্রথম চখের শাদা রঙ তাহার পর চখের তারার কাল রঙ ছুটিতে থাকে; বোধ হয় যেন কতকগুলা কুঁদফুল উপরের দিকে ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে; ভোমরা গুলা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে।

তাহার পরে—অনেক পরে—ব্রহ্মাবর্ত্ত; সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর নদীদ্বয়ের মধ্যে দেবনির্ম্মিত দেশ। আদিম

আর্য্যভূমি—চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উৎপত্তিস্থান। তুমি তাহার উপর ছায়াপাত করিয়া গমন করিবে। ক্রমে কুরুক্ষেত্র, তথায় আজিও সেই ঘোরতর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের চিহ্ন সকল বিদ্যমান আছে। এখানে, তুমি যেমন কমলবনের উপর জলধারা বর্ষণ কর, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন তেমনি ক্ষত্রিয়গণের মুখোপরি শরবর্ষণ করিয়াছিলেন।

জান ত, বলরাম কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া সরস্বতীতীরে যোগসাধনে মগ্ন ছিলেন। তখন তিনি মদের পিয়ালা ত্যাগ করিয়াছিলেন—যে পিয়ালায় রেবতীর চক্ষু প্রতিফলিত হইত—সে পিয়ালা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন কেবল সরস্বতীর জলই তাঁহার পিপাসা দূর করিত ; তুমিও সেই সরস্বতীর জল পান করিবে, সে পবিত্র জলে তোমার ভিতরটা শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কেবল বর্ণটা মাত্র কাল থাকিবে।

সেখান হইতে কনখল যাইবে। কনখলে দক্ষযজ্ঞ হয়। সে যজ্ঞের কুণ্ড এখনও আছে। পাণ্ডারা পয়সা পাইলে এখনও তথায় হোম করিতে দেয়। কনখলের নিকটেই, ২।৩ মাইলের মধ্যেই গঙ্গা হিমালয় ছাড়িয়া সমতলে প্রবেশ করিতেছেন এবং সগরতনয়েরা স্বর্গে যাইবে বলিয়া সোপান পরম্পরার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। হরিদ্বারের উচ্চতা সমুদ্রের জল হইতে ৫০০।৬০০ ফুট। সেখান হইতে যত উচ্চে যাইবে দেখিবে গঙ্গা ধাপে ধাপে উঠিয়াছেন ; ক্রমে

২২০০০ ফুট পর্য্যন্ত গঙ্গা উঠিয়াছেন। এই ধাপে ধাপে সগরতনয়েরা স্বর্গে গিয়াছেন। যেমন ধাপে ধাপে গঙ্গার জল নামিয়াছে, অমনি ধাপে ধাপে ফেণা রাশীকৃত হইয়া আছে। তুমি যখন উপর হইতে দেখিবে, বোধ হইবে, দুধারে উচ্চ উচ্চ পাড়ের মধ্য দিয়া গঙ্গার খোলা—তাহাতে দূরে দূরে রাশি রাশি ফেণা—যেন দুইটা ঠোঁটের মধ্যে কেবল হাসি; ২২০০০ ফুট হইতে ৫০০ ফুট পর্য্যন্ত নামা পাহাড়ে এই হাসি দেখিলে বোধ হইবে যেন মা গঙ্গা গাল কাত করিয়া বিদ্রূপের হাসি—সর্ব্বনেশে হাসি হাসিতেছেন। গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গা উপরদিকে—যে দিকে বিষ্ণুর পাদ হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে—কমণ্ডলু হইতে শিবের জটায়, এবং তথা হইতে হিমালয়ে পড়িতেছেন—তরঙ্গ হস্ত বিস্তার করিয়া গঙ্গা মহাদেবের মাথার কেশ ধরিয়াছেন। তরঙ্গ, কপালে যে চাঁদের কলা আছে, তথায় আঘাত করিতেছে; দেখিল সতিনী গৌরী ঈর্ষা কষায়িত লোচনে ভ্রূকুটী করিতেছেন, তাই গঙ্গা গাল কাত করিয়া হাসিতেছেন।

গঙ্গার জল শাদা—নির্ম্মল, ফটিকের মত শাদা। তোমার সহিত সুরগজের বেশ তুলনা হইতে পারে; তুমি কাল। তুমি শুঁড়ের মত ডগ বাড়াইয়া জল খাও, তুমি যেখানে গঙ্গার জল খাইবার জন্য নামিবে তথায় তোমার কাল ছায়া সেই শাদাজলে খেলিতে থাকিবে; বোধ হইবে প্রয়াগ ছাড়া আর একজায়গায় গঙ্গা যমুনার মিলন হইল।

ক্রমে উঠিয়া তুমি হিমাচলে যাইবে। ইনিই গঙ্গার পিতা; ইনি বরফে সর্ব্বদা আবৃত। এই পর্ব্বতে উঠিয়া তুমি যখন বরফের চূড়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবে; বোধ হইবে যেন মহাদেবের ষাঁড়ের সিংএ পাঁক—এঁটেলামাটি লাগিয়া আছে।

তুমি দেখিবে হয়ত সরল গাছের কাঁধে কাঁধে ঘেঁষ লাগিয়া দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফুলকি উড়িয়া চমরী মৃগের লেজে পড়িতেছে আর তাহার লেজটী পুড়িয়া যাইতেছে। যদি এরূপ দেখিতে পাও তবে সহস্র সহস্র বারি ধারা বর্ষণ করিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিও। বড় লোকের সম্পদের ফল কেবল বিপন্নগণের বিপদ্ নিবারণ।

সেখানে আটপেয়ে মৃগ আছে। তাহারা যদি লাফাইয়া তোমায় ডিঙ্গাইয়া যাইবার জন্য আসে; শিল, বৃষ্টি, ঝড়, অন্ধকার করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। বিফল কাজে চেষ্টা করিতে গেলে কাহার না অবমান হয়।

সেখানে দেখিবে পাথরের উপর স্পষ্ট মহাদেবের চরণ চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। সিদ্ধগণ সততই সেখানে পূজা দিতেছে। তুমি ভক্তি ভাবে ভোর হইয়া নীচে নামিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিবে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ পাদপদ্ম দর্শন করিলে ভক্তেরা দেহান্তের পর অবিনশ্বর গণপদ পাইবার অধিকারী হন।

সেখানে বড় বড় বাঁশ গাছ আছে। সেই বাঁশে মাকে

মাঝে ছেঁদা আছে; সেই ছেঁদার মুখে বায়ু বহিতে থাকিলে পোঁ ওঁ ও ওঁ করিয়া শব্দ হয়। সেখানে কিন্নরী অর্থাৎ বাঙ্গালায় যাহাদের কান বলে (যথা মধো কান) তাহাদের স্ত্রীলোকেরা একযোগে মহাদেবের মহিমাঘোষণার্থ ত্রিপুর বিজয় গাহিতেছে। ইহার উপর যদি মেঘ ডাকিতে থাকে—সে ডাক যদি কন্দরায় কন্দরায় প্রতিধ্বনিত হইয়া পাখোয়াজের কাজ করে, তাহা হইলে মহাদেবের গান সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠে। একেবারে Concert হয়।

হিমালয়ে অনেক দেখার জিনিস আছে। সে সব একে একে দেখিয়া ক্রৌঞ্চ পাসে উপস্থিত হইবে। ১৬০০০ ফুটেরও উপর একটা পাস আছে অতি উচ্চ দুইটা পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটা ঘুলঘুলি মত আছে, তাই দিয়া তিব্বতে ও ভারতে যাতায়াত চলে। সেই গলির—ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া তোমায় যাইতে হইবে। ঐ গলিই কি আগে ছিল? আগে উহা নিরেট পর্ব্বত ছিল। পরশুরাম বাণ মারিয়া পাহাড় ফাঁড়িয়া ঐ গলিটুকু বাহির করিয়া দেন।

এতক্ষণ তোমার যাবার মত প্রশস্ত অবাধ পথ পাইয়াছিলে, এখন আর তেমন পথ নাই। ঐ গলির ভিতর দিয়া তোমায় যাইতে হইবে। তুমি সহজে ডানা মেলা পাখীর মত যাইতে পারিবে না। তোমায় কাত হইয়া যাইতে হইবে—আরও কাত—আরও কাত—আরও কাত হইয়া যাইতে হইবে। নারায়ণ বলিচ্ছলনাকালে যেমন একটা পা

উঁচা করিয়া—তের্‌চা করিয়া দিয়াছিলেন। তোমায় তেমনি ভাবে যাইতে হইবে। এই পাস পার হইয়াই দেখিবে কৈলাস। সব শাদা—স্বর্গের রমণীগণের আর এখানে আরসীর দরকার হয় না। স্বচ্ছ বরফাবৃত কৈলাসই তাহাদের দর্পণের কাজ করে। তাহার বড় বড় শিখর—সব বড় বড় বরফাবৃত—শাদার উপর শাদা—গাদা গাদা শাদা—যেন কুমুদ ফুলের রাশি চারিদিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। যেন মহাদেবের অট্টহাস, দিন্‌কের দিন জমা করিয়া বড় বড় গাদা দিয়া রাখিয়াছে।

কাজলের রঙে চোখ জুড়াইয়া যায়; কাজলের ডেলা যদি ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, ভিতরের রঙ কতই নয়ন রঞ্জন হয়, তোমার রঙ ঠিক কাজলের ডেলাভাঙ্গা রঙ্, ; আর কৈলাসের রঙ কেমন? এইমাত্র যে হাতীর দাঁতটী চেরা হইল, তাহার ভিতরকার রঙের মত চক্‌চকে, চোখ-জুড়ান প্রাণ-জুড়ান শাদা। এই কাল তুমি যখন এই শাদা চূড়ায় বসিবে তখন লোকে এক দৃষ্টে দেখিবে যেন বলরামের বিরাট শাদা দেহে—কাঁধে নীলাম্বরী ফেলা আছে।

এখানে গিয়া যদি দেখ মহাদেব হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন; পাছে পার্ব্বতী ভয় পান বলিয়া সাপের বালা ফেলিয়া দিয়াছেন, আর পার্ব্বতী সে হাত ধরিয়া পদব্রজে ক্রীড়াশৈলে উঠিতেছেন; তবে এক কাজ করিবে। তোমার দেহমধ্যে যে

জল আছে, সে জলকে স্তম্ভন করিবে; পর্ব্বত যে ভঙ্গীতে উঠিতেছে সেই ভঙ্গীতে আপনার দেহটী পর্ব্বতের গায়ে বসাইবে। তুমি যেন একটা গদীপাতা সিঁড়ি হইবে; আর পার্ব্বতীর উঠিতে কোনই কষ্ট হইবেনা।

বেদের মতে আর কালিদাসেরও মতে মেঘটা একটা জল ভরা ভিস্তীর মত। তুমি হাতের কাছে আসিলে সুরযুবতীরা বালার হীরার খোঁচা মারিয়া তোমার গায়ে ছেঁদা করিয়া দিবে, তাহাতে তোমা হইতে সহস্র ঝারার ন্যায় জল পড়িবে। তোমার সঙ্গে যাহারা এরূপ কু-ব্যবহার করিবে, তুমি জল ঢালিয়া তাহাদের জব্দ করিবার চেষ্টা করিবে। যদি সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। খুব গড় গড় গড়, গড়, গড়, করিয়া, গর্জ্জিয়া উঠিবে। খেলা করিতে গিয়া তাহারা চাপল্য দেখাইয়াছে বই নয়; তাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া উঠিবে।

তুমি মানসসরোবরের জল গ্রহণ করিবে। ঐ জলে সোনার শতসহস্র পদ্ম ফুটিয়া আছে। তুমি ঐরাবতের মুখে লাগিবে। মুখে কাপড় দিলে যেমন আনন্দ হয় ঐরাবতের ক্ষণকাল তেমনি আনন্দ হইবে। যেমন বাতাসে কাপড় নড়ে তেমনি তুমি কল্পদ্রুমের পাতাগুলি নাড়িবে। এইরূপে নানা প্রকারে—হে জলদ,তুমি সেই পর্ব্বতরাজকে উপভোগ করিবে।

সেই পর্ব্বতের ক্রোড়ে নগরী। পর্ব্বত যেমন

উঁচানীচা হইয়াছে, সেই বশে পর্ব্বতগাত্রে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নগরী হইয়াছে, বোধ হইতেছে কোন রসিকা প্রণয়ী পর্ব্বতের ক্রোড়ে এলো থেলো হইয়া শুইয়া আছে। পাশদিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। মেঘ দক্ষিণে একটু দূর হইতে—উচ্চ হইতে—দেখিতেছে যেন একখানা আঁচলা পড়িয়া আছে। বোধ হইবে এ আর কিছুই নহে—ঐ কামিনীর কাপড় খান; একটী কোণ মাত্র গায়ে ঠেকিয়া আছে। মেঘের সময়ে এই নগরের বড় বড় বাড়ীতে (যাহার ছাত খোলার তৈয়ারি চালমাত্র) চালে মেঘ পড়িয়া আছে। খোলা বাহিয়া জল বিন্দু পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন কামিনী কুলের নিবিড় কৃষ্ণ ঝাপটার কেশে মুক্তার মালা ঝুলিতেছে। এই নগর দেখিয়া তুমি উহাকে যে অলকা বলিয়া চিনিতে পারিবে না—এমত কথাই নহে।

এতদূরে পূর্ব্বমেঘের ব্যাখ্যা শেষ হইল। পূর্ব্বমেঘে সমস্ত জড়পদার্থই চৈতন্যময়। মেঘ চেতন, রামগিরি চেতন, আম্রকূট চেতন, নর্ম্মদা চেতন, বেত্রবতী, নির্ব্বিন্ধ্যা, গম্ভীরা, গন্ধবতী সবই চেতন। নদীগুলি বিশেষ চৈতন্যময়, প্রেমময়, প্রেমোন্মাদময়। কালিদাস প্রতি কথায় তাহাদের চৈতন্য, বুদ্ধি, ও হৃদয় দেখাইয়াছেন; তাহারা সকলেই মেঘের প্রেমে আকুল। প্রেমে আকুল হইলে মানুষে যাহা করিয়া থাকে—তাহারা সে সকলই

করিতেছে; আমরা আর তাহাদিগকে জড় বলিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। এইরূপে কালিদাস রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া অলকা পর্য্যন্ত সমস্ত জড় জগৎকে চৈতন্যময় করিয়াছেন; যেন এই সমস্ত স্থানের নদনদী, পর্ব্বত, কন্দর, ভূচর, খেচর, জলচর, এমন কি পুঁটি মাছটী পর্য্যন্ত যক্ষের দুঃখে দুঃখী,—যক্ষের বিরহে কাতর। যক্ষের দূত হইয়া মেঘ অলকায় যাইতেছে; সকলে মিলিয়া মেঘকে খুসি করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেহ শিখরে স্থান দিতেছে; কেহ অট্টালিকার অগ্রদেশে ধারণ করিতেছে; কেহ জল দিয়া উহার দেহে বল জন্মাইয়া দিতেছে। কেহ বা জল বাহির করিয়া উহার গতিলাঘব সম্পাদন করিতেছে। সমস্ত জড় জগতে যেন কেমন একটা একপ্রাণতা জন্মিয়া গিয়াছে। মেঘটী যক্ষের প্রাণ—মেঘ যাইতেছে, আমরা যেন দেখিতেছি যক্ষের প্রাণই ছুটিতেছে; আর যাহা কিছু দেখিতেছে আপনার উপযোগী করিয়া—আপনার করিয়া লইতেছে; আপনার প্রাণের সহিত—প্রেমময় আবেশময় ভাবের সহিত মাখিয়া লইতেছে। তাই জড়ের এত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। রঘুবংশের ত্রয়োদশে সমস্ত জগৎ, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, কানন যেমন রামসীতার পুনর্মিলনে একটা আনন্দের, সুখের, স্বপ্নের ছায়ায় আনন্দময়, সুখময়, স্বপ্নময় হইয়া উঠিতেছে, মেঘদূতে তেমনি সমস্ত জগৎ যক্ষের বিরহে—যক্ষের ভোগলালসায়—যক্ষের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায়

অনুপ্রাণিত হইয়া যাইতেছে। রঘুর ত্রয়োদশে রাম আনন্দে বিভোর হইয়া—শত্রুনাশ হইয়াছে—সীতার উদ্ধার হইয়াছে,—জগৎ জুড়িয়া বীরকীর্ত্তি ঘোষণা হইয়াছে,—বংশের কলঙ্ক ক্ষালন হইয়াছে—তাই—আনন্দে বিভোর হইয়া সীতাকে জগৎ দেখাইতেছেন; জগৎও যেন সেই মহা আনন্দে বিভোর। যক্ষ বেচারা পরম আনন্দে ছিল। মনের মত মানুষ পাইয়াছিল, প্রেমে—সুখে—মোহে—আর মোহিনীতে মজিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উপর ঘোর দণ্ডাজ্ঞা। সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল। উহারা দেবযোনি, মানুষ ত নয়, যে প্রতিহিংসার চেষ্টা করিবে; কুবেরকে শিক্ষা দিবে। সে জানিল এ শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে—এখন কেবল একটা সংবাদ দিয়া স্ত্রীটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। তাহার আর ভাবনা নাই; কেবল স্ত্রীর ভাবনা, সেই ভাবনা সে জগৎময় ছড়াইয়াছে।

রঘুবংশে রাম ও সীতা সশরীরে যাইতেছেন, তাঁহারা নারায়ণ ও লক্ষ্মীর অবতার; জড় জগৎ তাঁহাদের অনেক নীচে। তাঁহারা উপর দিয়া যাইতেছেন,—কখন মেঘের নীচে দিয়া, কখন মেঘের মধ্য দিয়া, কখন মেঘের অনেক উপর দিয়া যাইতেছেন। দেবতাদেরও যাঁহারা দেবতা তাঁহাদের যেরূপ সরঞ্জামে যাওয়া উচিত; রামসীতাও সেইরূপ সরঞ্জামে যাইতেছেন। জড় জগত হইতে তাঁহারা অনেক দূরে—অনেক উপরে। তাঁহারা চৈতন্যেরও চৈতন্য। জড়

জগত তাঁহাদের কাছে সামান্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর—খেলার জিনিস। আর মেঘদূতে যক্ষ বেচারা আপনার দুঃখমাখা, বিরহমাখা, প্রাণটীকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার জড় দেহ কোথায় পড়িয়া আছে। যে ছুটিতেছে সে অধিক উঠিতে পারিতেছে না, কিন্তু অনেক নীচে নামিতেছে। নদীর খোলায় পড়িতেছে খাদে পড়িতেছে, জড় জগতের সঙ্গে মিলিতেছে, মিশিতেছে, এক হইয়া যাইতেছে। দুঃখ দুর্ভরতা-সত্ত্বেও—প্রাণের কান্নাসত্ত্বেও—সে যেন জড় জগৎ উপভোগ করিয়া যাইতেছে। উপভোগ করিয়া যাইতেছেই বা বলি কেন? সে যেন সমস্ত জড় জগতের নিকট সমবেদনার মুষ্টি ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে। আর কবির কবি, কবিকুলের গুরু, তাহার উপর সেই সমবেদনা ঢালিয়া দিতেছেন ; জগৎময় তাহার জন্য সমবেদনার উৎস খুলিয়া রাখিয়াছেন।



উত্তরমেঘ।

দেখ মেঘ, অলকায় বড়বড় অট্টালিকা আছে; তাহারা অনেক বিষয়েই তোমারই সমান হইতে পারে। দেখ, তোমার বিদ্যুৎ আছে, তাহাদের আছে রমণী,—বিদ্যুত-বরণী—চঞ্চল চরণে চলিয়া বেড়াইতেছে। যত বার চোখে পড়িতেছে চোথ ঝলসিয়া যাইতেছে। তোমার রামধনু আছে, কত বিচিত্র রঙ—কেমন উজ্জ্বল, তাহাদের চিত্র আছে, কত বিচিত্র রঙ,—কেমন উজ্জ্বল। পাহাড়ীরা ছবি বড় ভাল বাসে; সবারই ঘরে ছবি আছে। পেকিন টোকিও হইতে আরম্ভ করিয়া রোম পারিস প্রভৃতি সকল দেশের ছবিই ইহারা সংগ্রহ করিয়া রাখে। নেপালে এক একবার তসবীর যাত্রা নামে উৎসব হয়; ঐ উৎসবের দিন, নানাদেশের ছবি, যাহার যাহা আছে আনিয়া কোন একটা গলির দুধারে টাঙাইয়া দেয়; আর দর্শকেরা দেখিতে দেখিতে গলির এক প্রান্ত হইতে

অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। অধ্যক্ষেরা মন্দ ছবি টাঙাইতে দেন না। তোমার গম্ভীর গর্জ্জন আছে—সে গর্জ্জনে কাহার না কান জুড়াইয়া যায়? তাহাদের আছে পাখোয়াজের আওয়াজ। অনেক সময় পাখোয়াজের আওয়াজ আর দূরস্থ মেঘ গর্জ্জনের ইতর বিশেষ করা যায় না। তুমি মেঘ, তোমার ভিতরে জলভরা, আর তাহাদের মেজেগুলি চন্দ্রকান্ত মণিময়; মণি হইতে অনবরত জলক্ষরণ হইতেছে। তুমি উচ্চ, আর অট্টালিকার অগ্রভাগ গুলি—চূড়া—শিখরগুলিও উচ্চ; তুমি তাহাদের উপর উপর দিয়া চলিয়া গেলে বোধ হয় তাহারা মেঘের তলদেশ লেহন করিতেছে।

শরতে পদ্ম ফুটে; অলকায় রমণীকুলের সবারই হস্তে পদ্ম আছে, তাহারা পদ্ম লইয়া খেলা করে। হেমন্তে কুন্দ ফুল ফুটে; তাহাদের নিবিড় কৃষ্ণ অলকের মাঝে মাঝে কুঁদফুলের ঝারি। শীতে লোদ ফুল ফুটে, লোদফুল বড় শাদা; তাহার পরাগ আরও শাদা, সেই পরাগ মাখিয়া উঁহাদের মুখের শাদারঙ, আরও শাদা, চকচকে শাদা করিয়া তুলিয়াছে। বসন্তের একটা ভাল আসবাব কুরুবক—কেমন শাদা ও গোল; খোপার দুপাশে দুটী কুরুবক যেন দুটী শাদা প্রজাপতি উড়িতেছে। গ্রীষ্মে শিরীষ ফুল ফোটে; কেমন মৃদুগন্ধ, কেমন দেখিতে ছোট চামরটীর মত; চামরের গোড়াটা একটু লালচে, সূতাগুলি শাদা,

একটু হলুদের আভা আছে মাত্র, আর ডগটীতে কেমন একটু মোলাএম সবুজের আভা। শিরীষ কানে পরা; গালের উপর ঝুলিতেছে, আর মৃদুগন্ধে নাক ভরিয়া যাইতেছে। বর্ষার প্রধান সম্পত্তি কদম ফুল খোঁপার দড়ি দিয়া সিঁতার উপর আটকাইয়া রাখিয়াছে। বধূরা নিত্যই ছয় ঋতুর ফুলে নিজ দেহ সুসজ্জিত করিতেছে।

অলকার বাড়ীর ছাদগুলি শাদা—চক্‌চকে শাদা—মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধান। সেই শাদা পাথরের ভিতরে আকাশের তারাগুলির ছায়া খেলিতেছে। বোধ হইতেছে, শাদা পাথর বাঁধান ছাদে শাদা ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে। সেই ছাদে বড় বড় যক্ষ মহাশয়েরা পরম রূপবতী রমণী লইয়া মধুপান করেন। এ যে সে মদ নহে। কল্পবৃক্ষ হইতে ইহার উৎপত্তি। ইচ্ছামাত্র তাঁহারা পাইতেছেন। তাঁহারা মধু পান করিতেছেন, সঙ্গে বরনারী; আর সেই সময় মেঘ মন্দ্রে পাখোয়াজ বাজিতেছে। জমাটের পর জমাট হইয়া যাইতেছে।

এখানকার কিশোরীদের রূপই বা কি? দেবতারাও সে রূপের জন্য লালায়িত। এই যক্ষ রমণীরা মন্দাকিনীর বালির চড়ায় মণি ফেলিয়া দেন, আর তাহার উপর সোণার বালি ছড়াইয়া দিয়া উহাকে লুকাইয়া ফেলেন, তারপর "খুঁজি খুঁজি নারি" করিয়া খুঁজিতে থাকেন। বায়ু-দেব মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হন—এবং

উঁহাদের সেবা করেন। বড় ক্লান্ত হইলে উঁহারা তীরবর্ত্তী মন্দার বৃক্ষের ছায়ায় ঠাণ্ডায় বিশ্রাম করেন। এই খেলা খেলিতে উহাদের সময় কাটিয়া যায়।

যক্ষ রমণীদের ঠোঁট দুটী ঠিক দুটী তেলাকুচার মত। বড় মনোলোভা। সে অধরে দৃষ্টি পড়িলেই, যক্ষ বাবুরা আস্তে আস্তে আসিয়া আদর করিয়া উহাদের গরদের সাড়ীর গাঁইট ধরিয়া উপরে টানিয়া তুলেন, আর সাড়ী আলগা হইয়া যায়; অমনি তাঁহারা সেই গরদের কাপড় টানিতে থাকেন। তখন মন প্রেমে গরগর—হাতের আর বিশ্রাম থাকে না। রমণী স্বতঃই লজ্জাশীলা; ভয়ে—লজ্জায়—প্রদীপ নিবাইবার চেষ্টা করেন। সম্মুখে যে কোন গুড়া জিনিস পান প্রদীপের দিকে ফেলিয়া দেন; কিন্তু সে প্রদীপ নিভিবে কেন? সে যে রত্নের প্রদীপ, তেল বাতির প্রদীপ ত নয়। তাঁহাদের সব চেষ্টা বিফলা হয়, তাঁহারা সরমে মরিয়া যান; আর—তাঁহাদের কর্ত্তাদের জয় জয় কার।

সততগতি বায়ুর নাম। সেই বায়ু ঠেলিয়া ঠেলিয়া তোমার মত মেঘকে ঐ সকল অট্টালিকার উপরের তালায় লইয়া যায়। ঘরের ভিতর মেঘ ঢুকিলেই ছবি গুলির উপর বিন্দু বিন্দু জল দাঁড়ায়, সুতরাং উহাদের দোষ জন্মে। তখন তাহারা যেন ভয়ে ভীত হইয়াই—ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলিতে ফেলিতে জানালা দিয়া পালাইয়া যায়। কিন্তু

গরাদেয় গরাদেয় ভাঙিয়া জর্জ্জর হওয়ায় বোধ হয় যেন ধূঁয়ার আকার ধারণ করিয়াই যাইতেছে। সংস্কৃতে কথাগুলি এমনি করিয়া সাজান আছে যে, তাহার ভিতর ভিতর আরও একটি মানে আছে, সে মানেটি এই—দেখ যাহাদের সদাসর্ব্বদা বাড়ীর ভিতর গতিবিধি আছে, তাহারাই সঙ্গে করিয়া পর পুরুষকে—বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে পারে। লইয়া গেলেও নির্জ্জন ও নিঃশঙ্ক বলিয়া উপরের তালায়ই লইয়া যায়। সেখানে সে যদি অন্তঃপুরে কোনও দোষ উৎপাদন করে, তখনই তাহার ভয় হয়; সে জানালা দিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, প্রহারে জর্জ্জরিত হয় আর প্রহারের চোটে ধুঁয়া বাহির হইতে থাকে।

এখানে বিলাসিনীদের অঙ্গ-গ্লানি কিসে যায় জান? যখন দৃঢ় বন্ধনের পর—দৃঢ় আলিঙ্গনের পর—প্রিয়তমের হস্ত শিথিল হয় আলিঙ্গনও ক্রমে ঢিলা হইয়া আসে; তখন রমণী কুলের দেহের ব্যথা কিসে নিবারণ হয় জান? না জান ত বলি, শোন। ঘরে বা খাটে যে চাঁদোয়া খাটান আছে, তাহার চারিদিকে ঝালর আছে; ঝালরের প্রতিসূত্রে চন্দ্রকান্ত মণি আছে। তুমি সরিয়া গেলে সেই মণিতে চাঁদের আলো লাগায় তাহা হতে জল পড়িতে থাকে। সেই জলে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ হয়। এখানে একটা কথা আছে, যক্ষ যক্ষী শুইয়া আছে কোথায়?—বাহিরে চাঁদোয়া খাটাইয়া, অথবা ঘরের ভিতরে খাটের মাথায় চাঁদোয়া খাটাইয়া? অত

শীতের দেশে প্রথম কথাটা বড় খাটে না। তাহা হইলে খাটের ঝালরে চাঁদের আলো লাগে কি রূপে? কৈলাস বড় উচ্চ, চাঁদ তাহার নীচে ঘুরে ; তাই তাহার ঊর্দ্ধগামী কিরণ গিয়া খাটের ঝালরে লাগে। কুমারে এইরূপে পদ্ম ফুটানর কথা আছে। এ ব্যাখ্যাও মনোমত হইল না। কারণ নিশীথে —চাঁদের আলো নীচে হইতে উপরে উঠিতে পারে না। তবে এককথা—মহাদেবের মাথায় যে চাঁদের কলা আছে, তাহা হইতে কিরণ আসিয়া ছাদের কাছে যে ঝালর আছে, তাহাতে লাগিতে পারে, কারণ মহাদেব বাহিরের বাগানে বাস করেন। এ কথাও ঠিক নহে, কারণ মহা-দেবকে দিয়া এ রকম কর্ম্মটা করান ঠিক নহে। তবে উহার ব্যাখ্যা এই যে কৈলাসের চূড়া সূর্য্যকক্ষ চন্দ্র-কক্ষেরও উপরে, সুতরাং উঁহারা যতই কেনন উঠুন না, আলো নীচে হইতেই লাগিবে। সূর্য্যদেব সুমেরুর চারিধারে ঘোরেন। কখনও তাহার উপরে উঠিতে পারেন না। চাঁদও এথানে সেই রূপ নীচে ঘোরেন, উপরে উঠিতে পারেন না।

এখনকার সৌখীন লোকের টাকার কমি নাই, তাহাদের বাড়ীর ভিতর এত নিধি আছে যে, তাহার ক্ষয় নাই। প্রত্যহ ইহারা নানারকম গল্প গুজব করিতে করিতে কুবেরের সহর-তলির বাগানে আমোদ আহ্লাদ করে। বাগানের নাম বৈভ্রাজ। এই বাগানে বড় বড় অপ্সরা তাহাদের সঙ্গে

থাকে। আর কিন্নরীরা উচ্চৈঃস্বরে কুবেরের যশোগান করে। আহা, তাহাদের গলা কি মিঠা! সেখানে রসবতীরা আপন বাড়ী ত্যাগ করিয়া রাত্রে পরের বাড়ী পর পুরুষের কাছে যান। মনে করেন কাজটা এমনি গোপনে গোপনে সারিলেন যে, কেউ তাহা টেরও পাইল না। কিন্তু সকালে সারা রাস্তায় তাঁহাদের যুদ্ধ যাত্রার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যাবার সময় এক একবার ভয়ে একেবারে নিঃশ্বাস পড়ে নাই, আবার এক একবার হাঁপাইয়াছেন, বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। যখন ভয় হইয়াছে, বার বার এদিক ওদিক চাহিয়াছেন, ঝাপটা হইতে মন্দার ফুল খসিয়া পড়িয়াছে। চন্দন দিয়া অলকা তিলকা কাটা ছিল, তাহা শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার অনেক খসিয়া পড়িয়া আছে। যে সোণার পদ্ম কাণে কুণ্ডল ছিল, তাহাও ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে। বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিলে, স্তনটা আরও উঁচা হইয়া উঠিয়াছে; স্তনের উপর যে মুক্তার হার ছিল, তাহা টানে টানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে; মুক্তা গুলা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। এতস্তেও ভামিনীরা ভাবিয়াছেন আমাদের যাত্রাটা খুব গোপনেই সারা হইয়াছে।

মদন ঠাকুর মহাদেবের উপর জারি করিতে গিয়া একবার খুব ঠকিয়াছিলেন, সেই জন্যে মহাদেবের ত্রিসীমানার মধ্যে ভয়ে আর ধনুক ওঁছান না। মহাদেব

অলকায় নিত্য বাস করেন—সুতরাং অলকায় মদনের সে ফুলধনু—সে গুন্ গুন্ করা ভোমরার ছিলা-পড়িয়াই থাকে। তবে সেখানে মদনের এত আধিপত্য কি রূপে হয়? অলকায় প্রেমের ঢেউ—রসের তরঙ্গ—ভাবের লহর—কিছুরি অভাব নাই। এসব কিসে হয়? কি সে হয় বলিব? চঞ্চল সুন্দরীদের ঠমক চমক ওয়ালা হাবে ভাবে। তাঁহারা যখন ভুরু নাড়িয়া নয়ন বাণ ঝাড়িতে থাকেন, তখন কোন সহৃদয় পুরুষ সে বাণে বিদ্ধ হইয়া পাদুটী গোট করিয়া বাণে বিদ্ধ পক্ষীর মত ভূতলে লুণ্ঠিত না হয়?

কুবেরের দেশ এমনি আশ্চর্য্য দেশ, কিছুরই জন্য খাটিতে হয় না। কল্পবৃক্ষ আছেন। যা চাও তাই দেন। কেবল চাওয়ার পরিশ্রম। চাহিবামাত্র বোম্বে সাড়ী, বারানসী চেলি, পার্সীসাড়ী। চাহিবা মাত্র সাম্পেন, রোজালিন প্রভৃতি গোলাপী নেশার মদ—যে মদে প্রাণটা খুলে, মনটা ছুটে, চক্ষুটা ঢল ঢল করিতে থাকে, অথচ নেশায় বুঁদ হয় না। চাহিবামাত্র নানাফুল—একেবারে পাতাদিয়া তোড়াবাঁধা। চাহিবা মাত্র সব রকম গহনা। চাহিবা মাত্র তরল আল্তা, পায়ে দিলেই হয়, কচলাইবার দরকার নাই; পদ্ম ফুলের মত পায়ে বুড়া আঙুল দিয়া লাগাইলেই হয়। চাহিবা মাত্র যাতে যাতে রমণীর মন খুলে, প্রাণ খুলে, দেহে শোভা হয়, সে সবই এক কল্প বৃক্ষই দিয়া থাকেন।

সেই অলকায়—হায়, আমি এখন কোথায়? আর সে সুখের অলকাই বা কোথায়? সেই সুখের অলকায়—কুবেরের রাজবাড়ীর একটু উত্তরে—তোষাখানা, পিলা-খানা, আস্তাবল, কম্পাউণ্ড ছাড়াইয়া আরও উত্তরে আমার বাড়ী—তুমি অনেক দূর হইতে সে বাড়ী দেখিতে পাইবে। তাহার গেটটী অতি উচ্চ। গেটের দুই থামের উপরে প্রকাণ্ড গোল খিলান। তাহাতে কত চিত্র বিচিত্র করা, যেন একটী রাম ধনু। সেই গেট দেখিলেই তুমি চিনিতে পারিবে। যদিই না পার—দেখিবে দ্বারের পাশে একটী চারা মন্দারের গাছ। সেটী আমার গৃহিণীর পালক পুত্র। তিনি নিজে জল দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন। এখন তাহাতে থোলো থোলো ফুল ফুটিয়াছে। ফুলের ভরে গাছটী নুইয়া পড়িয়াছে। হাত বাড়াইলেই সে ফুল তোলা যায়। এই মন্দার গাছ দেখিলেই আমার বাড়ী তুমি চিনিতে পারিবে।

উহার মধ্যস্থলে একটী দীঘী। দীঘীতে সানবাঁধান সিঁড়ি। কিসের সান জান? সবুজ মণি দিয়া সান বাঁধ[illegible] বড় বড় সবুজ মণি। সবুজ মণির বড় বড় পাথর—তাই দিয়া ঘাট বাঁধান। দীঘীতে রাশি রাশি সোণার পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। বৈদুর্য্য নামে নীল মণিতে পদ্মের নাল তৈয়ারি হইয়াছে। হাঁসগুলা এই দীঘীতে এত আনন্দে—এত উল্লাসে—এত প্রেমে ভোর হইয়া বাস

করে যে, কাছেই মানসসরোবর—সেখানে যাইতেই চাহে না। সেই দীঘীর পাড়ে একটী ছোট্ট পাহাড়—আহা! সে আমাদের ক্রীড়ার ভূমি—মোলায়েম নীল মণি দিয়া তাহার চূড়া তৈয়ারি হইয়াছে। আর সেই পাহাড়ের চারিদিক বেড়িয়া সোণার কদলী বন। মরিরে—দেখিলে চোখ সেই খানে পড়িয়াই থাকে। তাহার কথা মনে হইলে এই দুঃখের দিনে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সে পাহাড়টী আমার গৃহিণী বড় ভাল বাসেন। যখনই দেখি তোমার নীলদেহের পাশ দিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে, আমার সেই নীল পাহাড়ের কথা মনে পড়ে—সেই সঙ্গে গৃহিণীর কথা মনে পড়ে—মনটা উদাস হইয়া যায়। উহারই কাছে কাছে একটী মাধবী লতার কুঞ্জবন। একটী লতা ঘূরিয়া ঘূরিয়া ঘূরিয়া অনেক জমি ঘেরিয়া একাই একটী কুঞ্জ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চারিদিকে আবার কুরুবকের বেড়া, আর তাহারই নিকটে একটী অশোক গাছ। শাদা ফুলের অশোক নয়—লাল ফুলের অশোক। থোকো থোকো ফুল উচা মুখ হইয়া ফুটিয়া আছে। পাতার গোড়ায়, ডালের গায়ে, গুঁড়ির উপর লাল থোকো ফুল উঁচাদিকে মুখ করিয়া ফুটিয়া আছে। তাহার উপর গরদের সাড়ীর মত পাতলা অথচ শাদা, চটাল অথচ ঈষৎ রক্তাভ নূতন পাতা গুলি আসিয়া পড়িয়া ঢাকা দিয়া ফেলিয়াছে। বাতাসে, সেই নূতন পাতা গুলি নড়িতেছে

আর ভিতর হইতে সেই ফুল এক এক বার দেখা যাইতেছে, আর এক একবার লুকাইতেছে। বল দেখি কেমন দেখাইতেছে? বুঝিয়াছ কি? কেন কবিরা রক্তাশোককে উদ্দীপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন? এই রাঙা ফুলের থোলো গুলাকে ঐ ভাবে দেখিলে মনটা খারাপ হয় না কি? মাধবীলতাকুঞ্জের পাশে একটী রাঙা অশোক ফুলের গাছ, আর একটী বকুলের গাছ, চির দিনই সবুজ— চির দিনই দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।

যক্ষ বলিতেছেন—ইহার মধ্যে একটী চান যে, তোমার সখী আমার সঙ্গে গিয়া উহাকে বাঁপায়ের লাথী মারেন; আর একটী চান যে, তোমার সখী উহার গায়ে মদের কুলকুচা করিয়া দেন। সংস্কৃত কবিকুল মনে করেন— স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা বলেন—যে, যুবক যুবতী একত্র গিয়া অশোক গাছের কাছে দাঁড়াইলে পর, যুবতী যদি বাঁ পায়ের লাথি মারে তাহা হইলেই তাহার ফুল হয়। আর মদের কুলকুচা না দিলে বকুল গাছের ফুল হয় না। এ কার্য্য কারণ ভাবটা ঠিক না; তবে কবিরা এ কথা বলেন কেন? সংস্কৃত কবিরা বড় দুষ্ট, বড় বাচাল, তাঁহারা অশোক পাতার লুকোচুরিটী বেশ তারাইয়া তারাইয়া বুঝিয়াছিলেন। এখন বল দেখি, সন্ধ্যার সময় যদি কোন যুবক যুবতী অশোক গাছের কাছে যায়, আর যুবক যদি ডান হাতের আঙুল হেলাইয়া

যুবতীকে ঐ লুকোচুরি ব্যাপারটা দেখাইয়া দেয়, যুবতী কি করেন? আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, তিনি "পোড়ার মুখ আর কি, আর মরণ নাই" বলিয়া গাছটীকে একটী বাঁপায়ের লাথী মারিয়া ছুটিয়া পলায়ন করেন, সে রাত্রে অন্ততঃ যুবকের কাছে মুখ দেখাইতে পারেন না। কবিরা কার্য্যকে কারণ করিয়াছেন আর কারণকে কার্য্য করিয়াছেন মাত্র। কথাটা ঠিকই বলিয়াছেন। বকুলের গন্ধটাও মহুয়ার মদের গন্ধের মত। বোতলে থাকা মদ নহে, পিয়ালায় থাকা মদ নহে, কুলকুচা করা মহুয়ার মদের মত উহার গন্ধ। তাই দুষ্টকবি একটা কার্য্যকারণ ভাব ঘটাইয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া রাখিয়াছেন।

এই গাছ দুইটার মধ্যে একটী সোণার খোঁটা পোঁতা। তাহার উপরে এক খানি স্ফটিকের তক্তা। পাছে খোঁটাটী স্ফটিকের ভরে পড়িয়া যায়, তাই সে খোঁটার গোড়াটী বেশ করিয়া বাঁধান। কি দিয়া বাঁধান? মণি-দিয়া বাঁধান। মণির রঙ্ কেমন? বাঁশের কোঁড়ের মত। খুব টাটকা কোঁড়ের রঙ ফিকে, সে রকম নয়। খুব উঠিয়া গেলে কোঁড়ের রঙ বড় ঘোরাল হয়, সে রকমও নয়। ইহার মাঝামাঝি অবস্থায় যখন মোলাএম সবুজ রঙের ছটায় বাঁশবনের কমনীয় কান্তি হয় সেই সময়ের কোঁড়ের মত রঙ। সেই তক্তায়——

"শিখী যথা কেকাভাষী সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উচা করি ঘাড়,
তাহারে নাচায় প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া
রুনু রুনু বাজে তার বালা।
স্মরিলে সে সব কথা মরমে জনমে ব্যথা
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।"

হে মেঘ, বেশ করিয়া মনে গাঁথিয়া লও—আমি যে সকল লক্ষণের কথা বলিলাম—মনে গাঁথিয়া লও। এই সব লক্ষণ দেখিলেই তুমি আমার বাড়ী চিনিয়া লইতে পারিবে। আরও দেখিবে—আমার বাড়ীর গেটের পাশে একটী শঙ্খ ও একটী পদ্ম আঁকা আছে। আমি এখন সে বাড়ীতে নাই, তাহার কি আর সে শোভা আছে? সে কান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য অস্তে গেলে কমলের কি আর কমলের মত শোভা থাকে?

সে বাড়ীতে যাবার সময় তুমি চট্ করিয়া ছোট হইয়া যাইবে। যেন শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পার। ঠিক যেমন আজ তোমায় দেখিতেছি—তুমি রামগিরির নিতম্বে পড়িয়া আছ—ঠিক এমনইটী হইবে। বরং ইহার চেয়েও ছোটটী হইবে। আমার খেলাবার ছোট পাহাড়টীতে বসিবে। তাহারও কেমন নিতম্ব আছে—তাহার উপর বসিবে। সেই খানেই বসিয়া একটু একটু বিদ্যুৎ ফুটাইয়া, একটু একটু আলো করিয়া বাড়ীর ভিতরে দেখিতে থাকিবে,

এমনি ভাবে দেখিবে যেন এক সারি জোনাকি বসিয়া টিপ্ টিপ্ করিতেছে। এই রূপ ভাবে দেখিলে আমার পত্নীকে দেখিতে পাইবে। আমি দূর দেশে আসিয়া পড়িয়া আছি, আর যে বেচারা—আহা, আমরা দুটি চকাচকির মত থাকিতাম—চকা হারাইয়া চকীর মত পড়িয়া আছে। তাহার মন বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে। দুঃখ ঘনীভূত হইয়া তাহাকে দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। শিশির পড়িতে আরম্ভ করিলে পদ্মের ঝাড় যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহার সে পদ্ম সে গৌরব সে নীল পাতা সে শাদা মৃণাল কিছুই ঠিক থাকে না। আমার গৃহিণীও ঠিক তেমনি হইয়া গিয়াছেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। আহা, সে কান্নার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—গরম নিশ্বাস অবিরাম পড়িতেছে, তাহার অধরোষ্ঠের সে টুক্‌টুকে লাল রঙ আর নাই। ফ্যাকাসে—পাঙাস হইয়া গিয়াছে। বাঁহাতে মুখ খানি রাখিয়া ভাবিতেছেন। ঝাপটা গুলা লম্বা হইয়াছে—ঝুলিয়া পড়িয়াছে—ডানি দিগের ঝাপটা গুলা মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে মুখ আর তেমন দেখাইতেছে না; তাহার সবটী দেখাই যাইতেছে না। তুমি পিছু লাগিলে চাঁদ বেচারার যেমন দুর্দ্দশা হয়, সে মুখেরও আজি তেমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে।

তুমি সেই ছোট পাহাড়টীর উপর বসিয়া একটু

একটু বিদ্যুৎ খুলিয়া মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া যখন ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে দেখিতে থাকিবে, তখন সে তোমার চোখে পড়িবে। কি ভাবে পড়িবে বলিতে পারি না, হয়ত, সে আমার কল্যাণে ঠাকুর দেবতার পূজা করিবে বলিয়া তাহারই সাজ পাট করিতেছে। না হয়—এক জায়গায় নির্জ্জনে বসিয়া একমনে—বিরহ ভুগিয়া আমি কেমন রোগা হইয়া গিয়াছি—তাই ভাবিয়া ভাবিয়া—সেই রকম আমার একখানি ছবি আঁকিতেছে। হৃদয় পটে চিরাঙ্কিত আমার মূর্ত্তি—কত রোগা হইয়াছে, এক মনে ভাবিয়া—এক মনে ধ্যান করিয়া—সে রোগা মূর্ত্তিটী চোখের সামে ধরিয়াছে—আর সেই মত ছবি উঠাই-তেছে। অথবা পিঁজরায় একটি সারী পাখী আছে—সে খাসা পড়ে,—তাহার কাছে গিয়া—দুঃখের সময় অন্যের কাছে যাইতে ভাল লাগে না, মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করি-তেছে—সারি! তুই ত প্রেমরসের রসিক, তুই ত ভালবাসা ভুলিবার পাত্র নহিস্, সেত তোকে এত ভাল বাসিত, তার কথা কি তোর মনে পড়ে? আহা, সেই নিবান্ধব পুরী মধ্যে এ দুঃসময়ে যক্ষিণীর কথার দোসর কেহ নাই, তাই সে সারিকার সঙ্গে প্রাণ পতির কথা কহিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে যাইতেছে। কালিদাস সমস্ত মেঘদূতে যক্ষ অথবা তাহার পত্নীর একটা সখা সখীর নামও করেন

নাই——এত গভীর বিরহে সখাসখী ভালই লাগে না——তাই বলেন নাই। এ সময়ে একা একা ধ্যানই ভাল,——তাহাতে যেন একটা ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি হয়, যেন দুজায়গায় দুটী মন, দুটী হৃদয়, ফোকস্ করিয়া বসিয়া থাকে, আর খবরাখবর লইতে থাকে ও পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত করিতে থাকে। অথবা দেখিবে সে একটী বীণা লইয়া আপনার কোলে রাখিয়াছে। বিরহিণী এক-বস্ত্রা—সে কাপড়—আটমাসে কাল হইয়া গিয়াছে—ময়লা হইয়া গিয়াছে। সেই ময়লা কাপড়ের উপর বীণা রাখিয়া গলা ছাড়িয়া গান করিতে যাইতেছে। কিসের গান? কে সে গান বাঁধিয়া দিল? কীর্ত্তনের সে পদ কোন মহাজন রচনা করিল? সে মহাজন আর কেহ নহে—সে নিজেই। সে গানে আর কিছুই নাই—কেবল আমার নামে পূর্ণ। সে পদে কেবল বলে, "নাথ হায়হায়" আর "নাথ এস এস"। এই গানে এক পালা মস্ত কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়, গান যেমন ধরিল, সুর যেমন উঠিল, অমনি চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল, সে জল গড়াইয়া বীণার তারে লাগিল। তার খ্যাৎ খেতে হইয়া গেল। কষ্টে সে জল মুছিয়া সে দোষ সারিয়া লইল। ফের গাইতে গেল কিন্তু সুর আর জমিল না; সে তার কাটিয়া গিয়াছে,—সে মূর্চ্ছনা ভুলিয়া গিয়াছে। আবার চেষ্টা করিল—আবার

তাই হইল। আবার তাই—আবার তাই—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল—বীণা রাখিয়া দিল।

কিম্বা দেখিবে—সে কপাটের পাশ হইতে কত গুলা শুক্‌না ফুল টানিয়া লইয়াছে আর মাটিতে ফেলিয়া তাই গণিতেছে। এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ, কুড়ি, এক শ, দু শ দু'শ চল্লিশ। যে দিন প্রথম বিরহ হইয়াছে, সেই দিন হইতে সে রোজ একটী করিয়া ফুল ঐ চৌকাটের পাশে ফেলিয়া রাখে—আর গণে,—গণিয়া দেখে—বিরহের কত দিন হইল—আর কতদিন বা বাকী আছে। অথবা দেখিবে, সে মনে মনে ধ্যান করিতেছে—আমি তাহার কাছে গিয়া পঁহুছিয়াছি, আর সে এক মনে এক প্রাণে আমার সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, বলিতেছে, নিষ্ঠুর, আমায় ফেলিয়া এত দিন কোথায় ছিলে? বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমার কণ্ঠে লগ্ন হইতেছে। তুমি যে কি ভাবে তাহাকে দেখিবে তাহার ঠিক নাই, তবে যেমন বলিলাম ইহার কোন না কোন এক ভাবে দেখিবেই দেখিবে। কেননা, প্রাণপতি কাছে না থাকিলে রমণীরা এই রকম কাজেই আপনাদের মনঠাণ্ডা রাখে।

দেখ ভাই, দিনের বেলায় তবু তার কাজ কর্ম্ম আছে—কতকটা অন্য মনস্ক হইতে পারে; বিরহের যন্ত্রণা কতক—যৎসামান্য পরিমাণে ভুলিতে পারে। কিন্তু রাত্রে—আহা, তাহার যন্ত্রণার পার নাই—তাহার শোক পারাবার উছলিয়া

উঠে—মন কিছুতেই শান্ত হয় না। তাই বলি ভাই, তুমি সেই অট্টালিকার ঝরকায় বসিয়া—গভীর রাত্রে তাহাকে দেখিবে—তাহার সহিত দেখা করিবে—সে সাধ্বী—পতি-প্রাণা—সে মেঝেতে পড়িয়া আছে, আর ঠায় সারারাত্রি জাগিতেছে—একটীবারও চোখ পালটিতে পারিতেছে না। গভীর রাত্রে দেখা করিতে বলিতেছি কেন জান? সে সময়টা নাকি বড় যন্ত্রণার সময়, সে সময়ে যদি তুমি তাহাকে আমার সংবাদ দাও—তাহার কতকটা সান্ত্বনা হইতে পারে, তাহার হৃদয়ের ভার কতক লাঘব হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম—জানালায় বসিয়া গভীর রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা করিও।

দেখিবে মনের কষ্টে সে রোগা, পাতলা, ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। যেমন প্রকাণ্ড কাল ময়লা আকাশে পূবের দিকে—যেখানে আকাশ পৃথিবীতে ঠেকিয়াছে—সেইখানে এক কলা চাঁদ পড়িয়া থাকিলে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিন শেষ রাত্রে সে চাঁদ দেখিয়া সহৃদয় লোকের চোখে জল আসে তেমনি সেই ময়লা বিছানার—বিরহে ভাল বিছানায় শুইতে নাই—বিছানা বদলাইতে নাই—একধারে পাশ ফিরিয়া ধনুর মতন বাঁকিয়া পড়া সেই শীর্ণা রমণীকে দেখিয়া তুমি শোক সম্বরণ করিতে পারিবে না। হায়, সে তখন কি করিবে? দেখিবে, কেবল কাঁদিতেছে—চোখের জলে বালিস ভাসিয়া যাইতেছে—গরম জল পড়িয়া বালিস হইতে

ভাব উঠিতেছে। রাত্রি আর পোহায় না—ক্রমেই যেন বাড়িয়া যাইতেছে। আর সে ভাবিতেছে, হায়! আমাদের একদিন ছিল, সারারাত্রেও কুলাইত না, কোথা দিয়া রাত্রি কাটিয়া যাইত টেরও পাইতাম না। আর এখন একি বিপরীত হইয়াছে। এ জ্বালা কিসে জুড়াই।

চাঁদের আলো আমাদের পুরাণ বন্ধু। কেমন ঠাণ্ডা ছিল, বোধ হইত দেহে যেন অমৃতধারা ঢালিয়া দিত। যাই—তাহার কাছে পড়ি গিয়া—সে হয় ত তেমনি করিয়া শরীর জুড়াইয়া দিতে পারিবে। এই ভাবিয়া—ঝরকা দিয়া যে চাঁদের আলো আসিতেছিল, তাহার উপর গিয়া পড়িল—তখনি ফিরিল—ফল উল্টা হইল। চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, চোখের জলে চোখের পাতাগুলা পুরু হইয়া আসিল। বড় খেদে চক্ষু বুজিবার চেষ্টা করিল, সে চক্ষু বুজিলও না খোলাও রহিল না, মাঝামাঝি—না এদিক্ না ওদিক্ হইয়া রহিল। সে চক্ষু স্থলপদ্মের মত বিস্তৃত ও বিশাল। দিন হইয়াছে অথচ সূর্য্যদেব মেঘে ঢাকা। এ অবস্থায় স্থলপদ্ম যেমন ফুটিতেও পায় না, মুদিতেও পায় না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, আমার গৃহিণীর চক্ষুও চাঁদের আলোর কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই ভাব হইয়া রহিল।

গৃহিণী বিরহে তেল মাখিয়া স্নান করিতে পারেন না, রুক্ষ নাহিয়া নাহিয়া তাঁহার ঝাপটার চুল গুলা শক্ত

হইয়াছে—ফর্‌ফরে হইয়াছে—গালের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গরম দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে—ঠোঁট দুটি আউসিয়া যাইতেছে—সেই নিশ্বাসের বাতাসে ঝাপটার ফর্‌ফরে চুল গুলা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর—স্বপ্নে আমার সঙ্গে দেখা হইতে পারে, এই ভরসায় নিদ্রার আরাধনা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রা কোথায় আসিবে? চক্ষু ত তাহার স্থান। জল আসিয়া চক্ষু ভরিয়া রহিয়াছে, বরং প্রবাহরূপে বহিয়া যাইতেছে। এ চক্ষে নিদ্রার জায়গা নাই। নিদ্রা আসিয়াও জায়গা পাইতেছে না।

বিরহের প্রথম দিন খোঁপা বাঁধা হইয়াছে। বিনা দড়িতে শুদ্ধ গিরা দিয়া আর বিননি করিয়া চুল বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে—ভরসা, শাপের অন্তে—বছর পুরিয়া গেলে—আমি গিয়া সেই খোঁপা হাসিতে হাসিতে খুলিয়া দিব। কিন্তু এখন তাহার কি দশা হইয়াছে। তাহাতে জট পড়িয়াছে, শক্ত ঘুঁটের মত হইয়াছে—খস্‌খসে—এবড়ো খেবড়ো হইয়াছে। চুল বাড়িয়া গিয়াছে—সেটা ঝুলিতেছে ঘুরিয়া আসিয়া গালের উপর পড়িতেছে—তাহার স্পর্শ আর সেরূপ সুখকর নহে, এখন সেটা কাঁটার মত ফুটিতেছে। সুতরাং গালের উপর হইতে সেটাকে সরাইতে হইতেছে। কি দিয়া সরাইবে? হাত দিয়া। সে হাতেও আবার বড় বড় নখ হইয়াছে। বিরহিণীকে কামাইতে নাই। রুক্ষ মাথা, চুলের গোড়া গুলা কুট্‌কুট্‌ করিতেছে, চুলের

আশায় শক্ত খোঁপা নড়্ নড়্ করিতেছে, সেটী গালের উপর পড়িয়া ছুঁচের মত বিঁধিতেছে—হাত দিয়া সরাইতে গেলে চুল নখে বাধিতেছে, তাহা গোড়া শুদ্ধ টান পড়িতেছে। কি যে একটা সর্ব্বাঙ্গে চিড়্‌বিড়্ চিড়্‌বিড়্ করিয়া উঠিতেছে, তাহার আর বর্ণনা করা যায় না।

মেঘ, তোমার ভিতরটা জলে ভরা, বড় ভিজা। যাদেরই অন্তঃকরণ ভিজা তারাই বড় দয়ালু। তাই তুমিও বড় দয়ালু। তুমি যখন তাহাকে দেখিবে, তাহার একখানিও গহনা গায়ে নাই। সে ননীর পুতলি——এই শোকে, এই দুঃখে, সে আর তার দেহ ভার বহিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কত দুঃখে কত কষ্টে সে শয্যার ক্রোড়ে দেহলতা ফেলিয়া রাখিয়াছে। হাতটী নাড়িতে যেন তার বড় কষ্ট। তাহাকে দেখিলে তোমার দয়ালু-হৃদয় গলিয়া যাইবে, আর তুমি চোখের জল ফেলিবে, নূতন জলের বড় বড় ফোঁটা পড়িতে থাকিবে।

আমি জানি, তোমার সখী আমার প্রতি বড় স্নেহবতী—প্রেমবতী—সেটী আমার দৃঢ় সংস্কার—সেই জন্যই প্রথম বারের বিরহে তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। তুমি মনে করিও না "গৃহিণী বড় ভালবাসেন" বলিয়া আমার মনে মনে বড় গুমর আছে, তাই আমি তোমার সঙ্গে এত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এত বকাবকি করিতেছি। তুমি মনে করিও না, আমি মনে মনে "মনকলা"

খাইয়া বসিয়া আছি, কাজে কিন্তু আর একরূপ হইয়া গিয়াছে—অথবা আমি মিছে ফাজিলামী করিতেছি মাত্র। এ সকল কথা তুমি মনে করিও না, কারণ আমি যাহা কিছু বলিয়াছি সমস্তই অল্প কাল পরেই তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। তখন আপনার চক্ষে দেখিয়া আমার কথায় তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে।

তুমি যখন তাহার নিকটে যাইবে, তাহার চোখের উপর পাতা নাচিতে থাকিবে। চোখের উপর পাতা নাচিলে মিলন হয়। তুমি মিলনের দূত—তাই তাহার চোখের উপর পাতা নাচিবে। আহা, সে চোখের উপর পাতা নাচিলে বড়ই সুন্দর দেখাইবে। সে চোখে কত কাল যে কাজল পড়ে নাই—তাহার ঠিক নাই। তাহার সে চকচকে তেলাল ভাব আর নাই। চারিদিকে ঝাপটা গুলা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ পাশের দিকে সে গুলার বড় প্রাদুর্ভাব। তাই আর আড় নয়নে চাহনি নাই। স্ফূর্ত্তি নাই বলিয়াও আড় নয়নে চাহনি নাই। মধুপান কত দিন বন্ধ হইয়াছে। তাই মদ খাইলে ভ্রূর যে খেলা ছিল, যে বিচিত্র ভঙ্গী ছিল, যে রূপ সরস ভাবে নড়ন চড়ন ছিল—তাহার কিছুই নাই। সমস্ত চোখটা কেমন একটু স্থির—কেমন একটু গম্ভীর,—কেমন একটু করুণ,—কেমন একটু থসথসে হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আবার যখন উপরপাতাটী

নাচিতে থাকিবে, বোধ হইবে যেন ভিতরে মাছ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আর তাহার ঘেঁস লাগিয়া পুষ্করিণীর জলে, ভাসা পদ্মটী একটু একটু নড়িতেছে। শুধু যে চোখের উপরপাতা নাচিবে এমন নহে, বামউরুও নাচিবে। বাম উরু স্পন্দন হইলে প্রিয়সমাগম হয়। তুমি গেলে— আবার যে তিনি আসিবেন সে ভরসা হইবে, তাই উরু নাচিবে। কলার গাছ দেখিয়াছ? শুকনা বাসনা সব ফেলিয়া দিলে কাঁচা খোলায়ঘেরা কলার গাছ দেখিয়াছ কি? তাহার রঙ দেখিয়াছ—কেমন চকচকে শাদা; দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়—এমন কলার গাছ দেখিয়াছ কি? তবে তোমার, সে উরু কেমন—তাহার কতকটা ধারণা হইবে। সে উরুতে সুখের দিনে কতই নখের দাগ পড়িত—এখন আর একটীও নাই। মুক্তা জালে সে উরু বেড়িয়া থাকিত; এখন আর তাহা নাই। বিধি বাম, সব গহনার সঙ্গে সে মুক্তা জালও চলিয়া গিয়াছে। আহা, পরিশ্রমের পর সে উরু আমি কত দিন স্বহস্তে টিপিয়া দিয়াছি। এখন সেসব কথা মনে হইলে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। তুমি গেলে আবার সে উরুতে স্পন্দন হইবে।

হে মেঘ, সে সময়ে সে যদি একটু ঘুমাইয়া থাকে,— সে যদি একটু সুখে নিদ্রা যায়,—প্রহর খানেক অপেক্ষা করিও, উহার পাশেই বসিয়া অপেক্ষা করিও।

কিছু বলিবে—সমস্ত কান পাতিয়া শুনিবে। কেন না—স্বামীর কোন প্রিয় সুহৃদের কাছে যদি তাহার কুশল সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে বড়ই আশ্বাস হয়। স্বামী কাছে আসাও যা আর এরূপ সংবাদ পাওয়াও প্রায় তাইই!—বাস্তবিকও অনেক দিনের উৎকণ্ঠার পর এমন একটা খবর পাইলে হৃদয়ের অনেক লাঘব হয়।)

হে মেঘ, আমার কথামত এবং তোমার আত্মীয় আত্মীয়ার উপকারার্থ তাহাকে এই কথা বলিবে। "তোমার সহচর এখন রামগিরির আশ্রমে রহিয়াছেন। তিনি প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। তিনি নিজে বিরহে দারুণ কষ্ট পাইতেছেন। তাই হে অবলে—অর্থাৎ এত যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে কি না এই ভয়ে তোমার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। জীবন হইলে মরণের মত সুলভ আর কিছুই নাই; সকলকেই মরিতে হইবে; কখন কে মরে ঠিকানা নাই। তাই সকলের আগে জিজ্ঞাসা করিতে হয় "ভাল আছ ত?"

"আহা সে কত দূরে, পড়িয়া আছে। কত দূরে—ধারণাই হয় না। আসিবে যে—তাহারও যো নাই।... বিধি বাম। আসার পথ একেবারে বন্ধ। সে—দিন রাত—মনে মনে কতই আশা করিতেছে—কতই সংকল্প, গড়িতেছে—ভাঙিতেছে—সে মনে মনে আপনার দেহ

তোমার দেহে মিশাইয়া দিতেছে ; তাহার নিজ দেহ ক্ষীণ, সে মনে মনে তোমার দেহও ক্ষীণ হইয়াছে স্থির করিয়া মানস চক্ষের সামনে তোমার তেমনি একটী ক্ষীণ দেহ রাখিয়া তাহাতে মিশাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার নিজের দেহ গাঢ় তপ্ত, সে মানসপটে * তোমার একটী গাঢ় তপ্তদেহ আঁকিয়া তাহাতে আপনার অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছে। তাহার চক্ষের জলই দিন রাত্রের সম্বল; সে মনে মনে তোমারও সেই রূপ একখানি ছবি আঁকিয়া আপনাকে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দিতেছে। তাহার নিজের উৎকণ্ঠার পার নাই, সে ভাবিতেছে—তোমারও উৎকণ্ঠার বিরাম নাই—তাই মনে মনে তোমার উৎকণ্ঠায় আপনার উৎকণ্ঠা মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিতেছে। তাহার দীর্ঘ নিশ্বাস ক্রমাগত পড়িতেছে, সে ভাবিতেছে,—হৃদয়ের আবেগে তোমারও বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, তাই সে মনে মনে তোমার বুকের উপর আপনি পড়িয়া তাহাতে লয় হইয়া যাইতেছে।

* যে কথা অনায়াসে চেচাইয়া বলা যায়, সে কথাও সখীদের সামনে তোমার কানে কানে বলিবার জন্য সে চঞ্চল হইত। কারণ তাহা হইলে কপোলে কপোল স্পর্শ হইবে। এই স্পর্শের লোভে লোক দেখিলেই তোমার সঙ্গে কানে কানে কথা কহিতে যাইত। যতই কাছে

আসিতে পারে ততই আনন্দ, এত টুকু তফাৎও তাহার সহিত না।

"কি বিধির বিড়ম্বনা, এখন সে, যতদূর পর্য্যন্ত কানে শোনা যায়—তাহার বাহিরে—যতদূর চোখে দেখা যায়—তাহারও বাহিরে—কতদূরে গিয়াছে—তাহার ঠিকানাই নাই। বড় উৎকণ্ঠা হইয়াছে তাই পদরচনা করিয়া এই সব কথা বলিয়া এতদূর পাঠাইয়াছে। কানে কানে প্রাণে প্রাণে বলিয়াও তৃপ্তি হইত না, আরও ভিতরে যাইতে—দুটীতে এক হইতে ইচ্ছা হইত, এখন তাহারই একটী দূর হইতে —আমি একজন অপরিচিত,—আমার মুখে তোমায় খবর দিতেছে—এই সকল কথা বলিয়া দিয়াছে, মন দিয়া শোন।"

"যখনি দেখি প্রিয়ঙ্গুলতা দুলিতেছে, পাঁচ ছ হাত উচা, না বৃক্ষ, না লতা, না গুল্ম, এমন একটী তরু, ডাল গুলি লতাইয়া ঘূরিয়া নীলবর্ণ পাতায় ডুবিয়া বায়ুভরে নড়িতেছে, হঠাৎ মনে হয় প্রিয়ার হাত পা দেখিতেছি। চঞ্চলসুন্দরীর অঙ্গলতা হাব ভাব বিকাশ করিতেছে। যখনই দেখি, হরিণ তাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ছুটিতেছে—আর তার ঢলঢলে চোখ আরও ঢলঢলে হইতেছে, হঠাৎ মনে হয়—প্রিয়ার সেই চঞ্চল চক্ষু দেখিতেছি। চাঁদের দিকে হঠাৎ চক্ষু গেলে মনে হয়—সে আমার সেই মুখ খানির ছায়ামাত্র—যখন দেখি, ময়ুরের পেখম গুটান রহিয়াছে—আর ভারে ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মনে হয় সে

মাথায় চুলের রাশি দেখিতেছি, গিরি নদী বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট ঢেউ গুলি নানা ভঙ্গীতে নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছে, মনে হয়—সে মুখের ভুরু দুটী বার বার নানা ভঙ্গীতে নাচিতেছে। কিন্তু কোথাও সে মুখের—সে শরীরের—সে কমনীয় দেহের একটা আদরা মাত্রও দেখিতে পাই না। মনে হয়—তিনি রাগ করিয়া আছেন, আমায় দেখা দিবেন না, সে প্রেমময় ছবির একটা আব্-ছায়াও আমায় দেখিতে দিবেন না।

নাই বা দিলেন, আমারও হাত আছে, আমিও ত দেবযোনি, চিত্রবিদ্যা আমার সিদ্ধবিদ্যা, কুবের সেটা ত কাড়িয়া লইতে পারেন নাই, আমি যাতে তাতে তাহারি একটা ছবি আঁকিব। একটা গেরিমাটীর ডেলা কুড়াইয়া লইলাম, একখানা বড় পাথরে তোমার একটা ছবি আঁকিলাম, মানময়ী ছবি আঁকিলাম, যেন তুমি রোষভরে চলিয়া যাইতেছ—সেই ভাবে ছবি আঁকিলাম; আর তোমার মান ভাঙ্গিবার জন্য "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া তোমার পায়ে ধরিবার জন্য পড়িলাম, অমনি চোখে জল আসিল, চোখ জলে ভরিয়া গেল, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না; সুখের আশা করিতেছিলাম—ভাঙ্গিয়া গেল। বিধি বাম—এ ভাবেও যে ক্ষণিক মিলন হইবে, তাহার সেটাও সহ্য হইল না, নিষ্ঠুর খল বিধাতা আমায় পাগল করিয়া তুলিল

'ছবিও' দেখিতে পাইলাম না। আবছায়াও দেখিতে পাইলাম না। ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, ঘুম আসিল, স্বপ্ন দেখিলাম, স্বপ্নে তোমায় পাইলাম, গলা জড়াইয়া ধরিলাম, গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। বাহু দুটী উচা করিয়া হাত দুটী বাধাইয়া তোমায় বাঁধিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছি, আমি ত স্বপ্নে বেশ আছি, কিন্তু বনদেবতারা—ক্ষেত্রপালেরা —শূন্যে আমার গাঢ় আলিঙ্গন দেখিয়া চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। টপ্ টপ্ করিয়া শিশির পড়িতেছে। সে ত শিশির নয়—তাঁহাদের চক্ষের জল। সে জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতেছে।

এমনি ফাকায় ফাকায় তোমার সঙ্গে আমার মিলন হইতেছে। উত্তর দিক হইতে—বরফের পাহাড় হইতে—যখন বাতাস দক্ষিণ মুখে আসিতে থাকে—দেবদারুর রেখাকার পাতাগুলি প্রথম অঙ্কুরের সময় জড়ান ছিল, সেই বাতাসে তাহা একটী একটী করিয়া ছুটিতে থাকে। দেবদারুর আটা পড়ে, তাহার গন্ধ মাখিয়া সে বায়ু মাতোয়ারা হয়, আর মাতালের মত বহিতে থাকে, আমি দৌড়িয়া গিয়া সেই বায়ু বুকে লাগাই। ভরসা—সে হয় ত তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। লোকে আপনার জনের কত কি তুলিয়া রাখে, বড় দুঃখের সময় এক একবার সে গুলি দেখে—আর সেই কথা মনে করে। কাপড় রাখে, বিছানা রাখে, জুতা রাখে, জামা রাখে, আংটী

রাখে, চুল রাখে, কত কি রাখে। আমার প্রবাসে আঁপনার জনের কিছুই সঙ্গে নাই, তাই ভাবি—যদি গায়ের বাতাসটাও পাই—তাই ছুটাছুটি করিয়া বাতাস ধরিতে যাই, সে বাতাস বড় কন্‌কনে তবুও তাই ধরিতে যাই।

তোমার বিরহে আমার বড়ই যন্ত্রণা হইয়াছে, সর্ব্ব শরীরে জ্বালা করিতেছে। আমার কেবল প্রার্থনা—রাত্রি কিসে ছোট হয়, কিসে এক ক্ষণের মত সারা রাতটা কাটিয়া যায়। কিন্তু তা ত হয় না, জ্বালায় ঘুম হয় না। তিন প্রহর বই রাত্রি নয়, কিন্তু এক এক প্রহব যেন এক এক যুগ হইয়া পড়িয়াছে। আমার কেবল প্রার্থনা—দিনের তাত্‌একটু কম হয়, রৌদ্রটা একটু নরম হয়, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সবকালেই একটু একটু নরম হয়। কিন্তু একে দেহের জ্বালা, তাহাতে ভীষণ রৌদ্রের প্রখর তাপ, দিনের বেলায় আগুণ ছুটিতে থাকে, আমার প্রার্থনা কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। ক্রমে অসহায়—হতাশ—উদাস হইয়া পড়ি, কাহার আশ্রয় লইব, কোথায় যাইব, কি করিব কিছুই বুঝিতে পারি না—বুক দমিয়া যায়, মন ভাঙ্গিয়া যায়, হাত পা আসে না। আবার মনে হয়, মানময়ি মানিনি আমার, চঞ্চল চক্ষু মিট্ মিট্ করিয়া আড়ে আড়ে আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছেন, আর মনে মনে হাসিতেছেন।

আমি ত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিয়া কোনরূপে এতদিন বাঁচিয়া আছি—কোনরূপে

ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আছি—মঙ্গলময়ি, তোমার মঙ্গলেই যখন আমার মঙ্গল, তুমি ভালবাস বলিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। তুমিও অত কাতর হইও না, বিরহসাগরে আপনাকে ভাসাইও না। পৃথিবীতে কাহার সুখ চিরদিন থাকে? কাহার সুখের স্রোত এক টানা বহিয়া যায়? কাহারই বা দুঃখ চিরস্থায়ী হয়? কাহারই বা সকল রাত্রে অমাবস্যা ঘোর করিয়া থাকে? মানুষের দশা চাকার মত ঘুরে, চাকার যেখানটা এখন সকলের নীচে, এখনি আবার সেই খানটা সকলের উপরে উঠিবে, সেই রকম সুখ আর দুঃখ যেন একটা চাকার উল্টা দিকে বাঁধা আছে, কখন সুখ উপরে উঠে দুঃখ নীচে যায় কখন বা দুঃখ উপরে উঠে সুখ নীচে যায়।

দেখ, নারায়ণ শয়ন হইতে উঠিলেই আমার শাপের শেষ হইবে। আর চারটী মাস আছে—চোখ বুজিয়া এই চারিটা মাস কাটাইয়া দাও। তার পর—শয়ন উঠিলে, উত্থান একাদশী শুক্ল পক্ষ—শরতের শুক্ল পক্ষ—কি চাঁদের আলো—মেঘের লেশ মাত্র নাই—জ্যোৎস্নায় দিক্ ভরিয়া যাইবে, যেন পুরু জ্যোৎস্না চারিদিকে ছাইয়া ফেলিবে। সেই শরতের রাত্রে সেই গাঢ় জ্যোৎস্নায়—এক বৎসরের যত ক্ষোভ মিটাইয়া লইব। মনে মনে যত সংকল্প করিয়া রাখিয়াছি—সব সিদ্ধ করিয়া লইব। যত আশা করিয়া রাখিয়াছি—সব পুরাইব। রাশি রাশি আশা করিয়া রাখিয়াছি—সব মিটাইয়া লইব।

মেঘ বলিতে পারে, "আচ্ছা আমি যে তোমার তরফ হতে তার কাছে যাব তার একটা নিদর্শন দাও, যে সে চিনিবে, নাহিলে সে যদি আমায় আমলই না দেয়।" তাই যক্ষ বলিতেছে—পাগলের এমন নাড়ীজ্ঞান—যে যাবার সময় একটা নিদর্শন দেওয়া দরকার। নিদর্শন লইয়া কবি কিছু গোলে পড়িলেন। হনুমান রামের আঙটী লইয়া গিয়াছিলেন। মেঘ কি লইয়া যাইবে? যক্ষের আছেই বা কি? যক্ষ নাহয় একখানা পাথরের উপর দুচারটা অক্ষর লিখিয়া দিতে পারিত, মেঘত আর পাথর খানা বহিয়া লইয়া যাইতে পারেনা! তাই কৌশলী কবি একটা নূতন পথ বাহির করিলেন। যক্ষ জানে আর তাহার স্ত্রী জানে এমন এক রাত্রের ঘটনা নিদর্শনের স্বরূপ তাহাকে বলিয়া দিলেন। বলিলেন—শুন মেঘ, তাহাকে এই গল্পটী করিও, তাহা হইলে সে তোমায় আমার দূত বলিয়া চিনিবে। বলিবে, "একদিন বিছানায় তুমি আমার গলাটী জড়াইয়া বেড়াবেড়ি করিয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলে, হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিলে। আমি বারবার জিজ্ঞাসা করিলে তুমি মনে মনে হাসিয়া উত্তর দিলে "ঠক্ জুয়াচোর! আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তুমি আর এক জনের সঙ্গে বিহার করিতেছ।" মেঘ যখন এত খবর বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে এ নিদর্শনটা ঠিক বহিয়া লইয়া যাইবে। আর এ নিদর্শন পাইলে তাহারও নির্ঘাত বিশ্বাস হইবে।

মেঘ যেন যক্ষপত্নীকে সম্বোধন করিয়া—যক্ষের কথা-কোট করিয়া বলিতেছে, "আমি যে তোমায় নিদর্শন দিলাম তাহা হইতেই তুমি বুঝিতে পারিবে আমি ভাল আছি। হে অসিতনয়নে—কৃষ্ণআঁখি, আমি জানি তোমার চক্ষু কাল বলিয়া তোমার মন কাল নয়। লোকে আমার নামে নানা কলঙ্ক রটনা করিবে, বলিবে—পয়সাওয়ালা লোক—বিদেশে পড়ে আছে—বছর ঘুরে আসে—সেকি অমনি আছে?" এ কলঙ্ক রটনা শুনিয়া তুমি আমায় অবিশ্বাস করিও না। বাজে লোকে বলে "অদর্শনে বিষময় ফল ফলে," "প্রেম বন্ধন দৃঢ় করিতে চাও সূতা খাট কর" ভাবে বিচ্ছেদ, হইল শুধু দিন কত চখের আড় হইলে—বিনা কারণে বা কোন অব্যক্তকারণে হৃদয়ের বন্ধন শিথিল হয়, ভালবাসা উপিয়া যায়, আর স্নেহ শুকাইয়া যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস—গাঢ়প্রণয়স্থলে, বিরহে কেবল ভোগ বন্ধ হয় মাত্র, প্রেম জমা থাকে; জমিয়া জমিয়া জমিয়া ভাণ্ডার ভরিয়া যায়। সে প্রেম কিন্তু আর কাহারও জন্য নহে—সেই তাহারই জন্য—সেই চির-বাঞ্ছিতেরই জন্য। ভোগ না হওয়ায় প্রেম ত জমা থাকেই—আরও একটী উপকার হয়, রস পাক হইয়া জমাট হয়, স্বাদ-বৃদ্ধি হয়। যাহারা উল্টা বোঝে বা উল্টা বলে, তাহারা প্রাকৃত জন, তাদের কথায় কান দিও না।

গৃহিণীর আমার এই প্রথম বিরহ—তাই তাঁর যন্ত্রণা

বড় বেশী। তাই আগে গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দাও, তাহার পর সে পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিও, সেখানে ষাঁড়ের প্রাদুর্ভাব বেশী, মহাদেবের একটা ষাঁড় তার শিখরগুলা উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। ষাঁড়ের দেশ না হলে—এমন প্রেমিক যুগলের বিচ্ছেদও ঘটায়? সেখানে বেশীক্ষণ থেকো না, চট ফিরে এসো। সে আমায় কি বলে—সেটা আমায় বলে যেও। তারও একটা নিদর্শন দিয়া যেও, তার মঙ্গল সংবাদ দিয়া যেও, সকাল বেলা কুঁদ ফুল গুলি যেমন বোঁটা আল্‌গা হইয়া পড়পড় হইয়া থাকে, আমার জীবনও প্রায় তেমনিই হইয়া আছে। একটা মঙ্গল সংবাদ পেলে বোঁটার আবার জোর হয়।

ওহে তেলকুচ্‌কুচে কাল মেঘ, বন্ধুর মত আমার ছোট উপকারটী করিবে বলিয়া স্বীকার করিলে কি? তুমি ধীর, তাই কথা কহিতেছ না, জবাব দিতেছ না, তাহাতে আমি অবশ্য মনে করিব না যে তুমি আমার কথা কানে তুলিলে না,—কারণ চাতকেরা যখন জল চায়, তুমি কিছুমাত্র শব্দ কর না, অথচ তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, তাহাদের জল দাও। কেহ কিছু চাহিতে আসিলে ভদ্রলোকে তাহার সে কাজটী করিয়া দেয়—তাহার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দেয় —সেই তাহার উত্তর। উত্তর দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি কিছুই নাই।

আমি তোমার কাছে বড় অন্যায় প্রার্থনাই করিলাম,

জানা নাই, শুনা নাই, এরূপ প্রার্থনাটা উচিত হয় নাই, তবে যাই হোক ভাই, ভালবাসার খাতিরেই হোক—অথবা "আহা বেচারা বড় কষ্ট পাইতেছে" এই বলিয়া দয়া করিয়াই হোক, আমার এই উপকারটা করিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা যায়, ভাই, সেই দেশে যাও। বর্ষায় তোমার শোভা বৃদ্ধি হোক। আশীর্ব্বাদ করি—তোমার যেন বিদ্যুতের সঙ্গে একক্ষণের জন্যও—এ রকম—আমার মতন—বিচ্ছেদ না ঘটে।

সম্পূর্ণ।